ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরাম : ভৌতিক গল্পের পরম্পরা

(এম. ফিল উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ)

গবেষক: সন্দীপ খেস

পরীক্ষার ক্রমিক সংখ্যা: MPBE194011

ক্রমিক সংখ্যা: ০০১৭০০১০৩০১২

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৩৩৪৯৫ (২০১৫-২০১৬)

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৯

তত্ত্বাবধায়ক- ড. বরেন্দু মণ্ডল

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

মে ২০১৯

মুখবন্ধ

ভূত সম্পর্কে আমাদের মনে একধরনের শিহরণ জাগানো কৌতূহল রয়েছে। এই কৌতূহল শৈশব কাল থেকে আমার মনের মধ্যে অবস্থিত ছিল। স্নাতকোত্তরে পাঠরত অবস্থায় থাকাকালীনত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'কঙ্কাবতী' উপন্যাস পাঠ করি এবং আধ্যাপকের আলোচনার মাধ্যমে ত্রৈলোক্যনাথ লেখা সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠি। এই লেখকের রচনা ও সমসাময়িক ভূতের গল্প পড়ার পর জানতে পারি শুধুই ভূতের গল্প বলা ত্রৈলোক্যনাথের অভিপ্রায় ছিল না তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। তেমনি পরশুরামের গল্পেও তিনি যে ধরণের ভূতের প্রসঙ্গ ব্যবহার করেছেন তা সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে। দু'জনেরই বক্তব্যের মূল বিষয় এক। রচনার আঙ্গিকগত কাঠামো শুধু আলাদা।

এরপর এম. ফিল কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুবাদে অধ্যাপক ড. বরেন্দু মণ্ডল স্যারের সঙ্গে আলোচনা করে এই বিষয় নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।তাঁরপ্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি কারণ তাঁর উৎসাহ আমাকে সাহস যুগিয়েছে। সর্বোপরি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানায় আমার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। তাদের সকলেরই কাছে আমি ঋণী। আমার আত্মীয়স্বজন, পরিবারবর্গ, বন্ধুবান্ধব এবং সহপাঠীরা সকলের উৎসাহ এই কাজে প্রেরণা দান করেছে।

সূচীপত্র

ভূমিকা ৩-৯

প্রথম অধ্যায় :

১) ক. পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সাহিত্যে ভূতের প্রসঙ্গ ১০-২০

১) খ. বাংলা ছোটগল্পের সূচনাপর্বে ভূত ও ভৌতিক প্রতিবেশ ২১-৩০

দ্বিতীয় অধ্যায় : ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে ভৌতিক আবহ ও ভূতেদের দ্বারা উনিশ শতকের সমাজ বর্ণনা ৩১-৫৮

তৃতীয় অধ্যায় : পরশুরামের গল্পে অদ্ভুত ও মজার ভূত ৫৯-৭৯

চতুর্থ অধ্যায় : ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরামের সৃষ্ট ভূতেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ৮০-৯২

উপসংহার ৯৩-৯৮

গ্রন্থপঞ্জি ৯৯-১০২

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে ভূত প্রসিদ্ধ চরিত্র। তা কখনো কখনো গল্প বা উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। অনেক ভূতের গল্পে বোঝানোর চেষ্ঠা করা হয় যে, চেনা জগতের বাইরেও একটা বৃহত্তর জগতের উপস্থিতি রয়েছে যা একই সঙ্গে বাস্তব জগতের সঙ্গে অবস্থান করে। ইংরেজি নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়র 'হ্যামলেট' নাটকে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মুখে বলিয়েছিলেন- 'There are more things in heaven and earth, Horatio,'-William Shakespeare(1564-1616): 'Hamlet'. বিংশ শতকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প' কাহিনিতেও লেখক বলেছেন-'জগতে কি ঘটে না ঘটে তাহার কতটুকুই বা আমরা খবর রাখি ? [*তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প* , পৃ.৪৪৬]

ভূতের গল্পে যখনই পাঠক সেই রোমাঞ্চকর জগতকে খুঁজতে চেষ্ঠা করে বাস্তবের জগতে ফিরে আসে তার কাছে সেই বইয়ের জগত অচেনা হয়ে যায়।কিন্তু মনের মধ্যে একপ্রকার রোমাঞ্চকর রোমহর্ষক ভীতি কাজ করে। এই ভূতের গল্পগুলি মানুষকে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে। 'ভূত' শব্দের অর্থ যদি বের করা হয় তাহলে জানা যাবে তার অর্থ 'অতীত' পাশাপাশি 'বর্তমান' অর্থেও এই শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং ভূত হল এমন কিছু যা সম্ভবত অতীত ও বর্তমানের যোগ সাধন করে। বর্তমানে 'ভূত' শব্দটি বিশেষ করে এমন কিছু বোঝায় যার সাথে রক্ত মাংস মানুষের সরাসরি কোনও যোগ নেই অর্থাৎ যার শরীর নেই এমনকিছু। কিন্তু তারা যেন কোনও সময়ে এই জগতেরই বাসিন্দা ছিল।

বাংলা সাহিত্যে ভূতেদের বিভিন্ন নাম ও তাদের অভিধানগত অর্থ হল-

খোক্ষশ= ছেলে ভুলানো গল্পে রাক্ষস জাতীয় জীব।

ডাইনী= ডাকিনী, মায়াবিনী, পিশাচী।

দানব= দনুজ।

দৈত্য= কশ্যপ-দিতির পুত্র, অসুর ।

পিশাচ= প্রেত, অতি পাপিষ্ঠ ও নিষ্ঠুর, নীচাশয়, স্ত্রী> পিশাচী

পেত্নী= স্ত্রী ভূত (ব্যঙ্গে) কুৎসিত বা নোংরা স্ত্রী।

প্রেত= ভূত, পিশাচ, মৃতের আত্মা।

ব্রহ্মদৈত্য= পিশাচ-ব্রাহ্মন প্রেত।

ভূত= দেবযোনি, শিবের অনুচর, প্রেত (গ্রন্থ- ছাড়ানো, নামানো, ঝাড়ানো, ভাগানো, ভূতে পাওয়া)। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর শাস্ত্রোক্ত উপাদান, ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম, প্রানী(সর্ব), অতীত, যাহা হইয়াছে।

যক্ষ= দেবযোনি, যক (ব্যঙ্গে) অতি কৃপণ, যক্ষরাজ- কুবের।

যোগিনী= দুর্গার ৬৪ সখী।

রক্ষ= [<রক্ষস (রক্ষস)] রাক্ষস।

রাক্ষস= পুরাণোক্ত মহাবন নৃশংস জাতি, রক্ষ, নিশাচর, কর্বূর, (ব্যঙ্গে) অতিভোজী, রক্ষ সম্বন্ধীয়।

শাকচুন্নি= শাঁকচূর্ণী/ শাঁকচুন্নী [শঙ্খচুর্নী, শাঁখিনী/শাঁকিনী] < শঙ্খিনী, প্রেতনী, সধবার স্ত্রীর প্রেত।

এছাড়াও বাংলা সাহিত্যে আরও অনেক ধরণের ভূতের উল্লেখ রয়েছে যা গল্প বা উপন্যাসে প্রচলিত। এই সমস্ত ভূত গুলির সৃষ্টি লোকবিশ্বাস অনুযায়ী। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ভূত হল-

- পেত্নী- পেত্নী হল সেই সব নারী ভূত যারা কিছু অতৃপ্ত আসা নিয়ে এবং অবিবাহিতভাবে মৃত্যু বরণ করেছে। এরা সাধারণত যে কোনও আকৃতি ধারন করতে পারে। পেত্নীরা সাধারণত ভীষণ বদমেজাজি হয় এবং কাউকে আক্রমনের পূর্ব পর্যন্ত স্পষ্টতই মানুষের আকৃতিতে থাকে। পেত্নীদের আকৃতিতে একটি সমস্যা রয়েছে, তা হল তাদের পাগুলো পিছনের দিকে ঘোরানো।
- শাঁকচুন্নি- শাঁকচুন্নি হল বিবাহিত মহিলাদের ভূত। যারা বিশেষ তৈরি বাঙালি শুভ্র পোশাক পরিধান করে এবং হাতে শাঁখা পরে। শাঁখা হল বাঙালির বিবাহিত মহিলাদের প্রতীক। শাকচুন্নিরা সাধারণত ধনী বিবাহিত মহিলাদের ভেতর ভর করে যাতে করে তারা বিবাহিত জীবন উপভোগ করতে পারে। লোকগাঁথা অনুসারে তারা আমগাছে বসবাস করে।
- চোরাচুন্নি- সাধারণত কোন চোর মৃত্যুবরণ করলে চোরাচুন্নিতে পরিণত হয়। চোরাচুন্নি অতীব দুষ্ট ভূত। এরা মানুষের অনিষ্ট করে। পূর্ণিমা রাতে এরা বের হয় এবং মানুষের বাড়িতে ঢুকে পড়ে অনিষ্ট শাধন করে। এদের হাত থেকে বাঁচার জন্য বাড়িতে গঙ্গাজলের ছিঁটে দেওয়া হয়।

- পেঁচাপেঁচি- এ ধরনের ভূত সচরাচর লোকালয়ে দেখা দেয় না। বাংলার বিভিন্ন জঙ্গলে এদের দেখা যায় বলে বিশ্বাস করা হয়। এরা সাধারণত জঙ্গলে দুর্ভাগা ভ্রমণকারীদের পিছু নেয় এবং সম্পূর্ণ একাকী অবস্থায় ভ্রমণকারীকে আক্রমণ করে মেরে ফেলে।
- মেছোভূত- এই ভূতেরা মাছ খেতে পছন্দ করে। মেছোভূত সাধারণত গ্রামের কোনও পুকুর পাড়ে বা লেকের ধারে যেখানে বেশি মাছ পাওয়া যায়। সেখানে বসবাস করে। মাঝে মাঝে তারা রান্না ঘর বা জেলেদের নৌকা থেকেও মাছ চুরি করে খায়। বাজার থেকে মাছ কিনে গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে ফিরলে এটি তার পিছু নেয় এবং নির্জন বাঁশঝাঁড়ে বা বিলের ধারে ভয় দেখিয়ে আক্রমণ করে মাছ ছিনিয়ে নেয়।
- দেও- এরা সাধারণত হিন্দুস্থানি নামে অবাঙালি ভূত। এধরনের ভূত নদীতে বা লেকে বসবাস করে । এরা লোকজনকে পুকুরে বা নদীতে ফেলে জলে ডুবিয়ে মারে বলে জনমতে প্রচলিত।
- নিশি- ভূতেদের মধ্যে ভয়ঙ্কর হল নিশি। নিশি গভীর রাতে শিকার কে ঘর থেকে বাইরে বের করার জন্য তার কোনও প্রিয় মানুষের গলায় নাম ধরে ডাকে। নিশির ডাকে সাড়া দিয়ে সে সম্মোহিত হয়ে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে, আর কখনো ফিরে আসে না । নিশিরা কোনও মানুষকে দুবারের বেশি ডাকতে পারে না।
- মামদোভূত- হিন্দু বিশ্বাস মতে, মুসলমান কী মারা গেলে সে মামদোভূত হয়।
- গেছোভূত- এই ভূত গাছে বসবাস করে।
- ব্রহ্মদৈত্য- এরা হল ব্রাহ্মণ ভূত। সাধারণত এরা ধুতু ও পৈতা পরিহিত অবস্থায় বিচরন করে। এদের কে পবিত্রি ভূত হিসাবে গন্য করা হয়। এরা সাধারণত কারও ক্ষতি করে না। তারা অত্যন্ত দয়ালু ও মানুষকে অনেক উপকার করে থাকে।

- আলেয়া- রাতের অন্ধকারে পুকুর পাড়ে, নদীর ধারে বা খোলা মাঠে আলেয়া দেখা যায়। মাটি থেকে একটু উঁচুতে আগুনের শিখা জ্বলতে থাকে। লোককথায় একে ভৌতিক আখ্যা দেওয়া হলেও বিজ্ঞানীদের মতে গাছপালা পচনের ফলে যে মার্শ গ্যাসের সৃষ্টি হয় তা থেকে আলেয়ার উৎপত্তি।
- বেঘোভূত- এরা হল সেই সব মানুষের আত্মা যারা বাঘের আক্রমনে মৃত্যুবরণ করে বলে বিশ্বাস করা হয়। সাধারণত সুন্দরবন এলাকায় এ ধরনের ভূতের কথা বেশি প্রচলিত। মাঝে মাঝে এরা গ্রামবাসীদের ভয় দেখানোর জন্য বাঘের স্বরে কেঁদে ওঠে।
- স্কন্ধকাটাভূত-

  এই ভূতেরা মাথাবিহীন হয়ে থাকে। সচরাচর এরা হল সেই সব লোকের আত্মা যাদের দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সময় মাথা কাটা গেছে। এই শ্রেণীর ভূতেরা সবসময় তাদের হারানো মাথা খুঁজে বেড়ায়।
- কানাভুলো- এই শ্রেণীর ভূতেরা পথিকের রাস্তা ভুলিয়ে দিয়ে অচেনা স্থানে নিয়ে আসে। এদের প্ররোচনায় পড়ে মাঝে মাঝে মানুষ একই রাস্তায় বার বার ঘুরপাক খেতে থাকে। ভূতরা কোনও নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছনোর পর তাকে কখনো মেরে ফেলে। এক্ষেত্রে সে তার জ্ঞান হারিয়ে ফেলে রাস্তার ধারে পড়ে থাকে। এ ধরনের ভূতদের রাতে গ্রামে মাঠের ধারে পথের মধ্যে দেখা যায়।
- ডাইনী- বাংলা লোকসাহিত্যে সাধারণত মহিলা যারা কালো জাদু জানে তাদেরকেই ডাইনী বলা হয়। এটা বিশ্বাস করা হয় যে , ডাইনীরা গ্রামের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়।

ত্রৈলোক্যনাথের পরবর্তীকালে বহু সাহিত্যিক ভৌতিক গল্প রচনা করেছেন। বাংলা ভাষাকে যিনি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গল্পে, কবিতায়, নাটকে অতিলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত প্রসঙ্গকে নানান সূত্রে কিংবা প্রসঙ্গে চিত্রিত করেছেন। তাঁর *কঙ্কাল, একরাত্রি, নিশীথে, ক্ষুধিত পাষাণ, মণিহারা* গল্প পড়লে সে কথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। তবে রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত গল্পের আরেকটি বিশেষত্ব হল গল্পের মুখ্য চরিত্রই গল্পের প্রবক্তা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই ধরনের গল্পে এমন একটা শৈলী ব্যবহার করেছেন যেখানে গল্পটি পড়লে মনে হয় যেন তিনি নিজেও শ্রোতা। সময় যখন আরো এগিয়েছে ভূতের গল্পের বীভৎসতা কমেছে এবং তার ধারনা পাল্টেছে। বিশ শতকের ভূত যেন আমাদের বাস্তব জগতেরই বাসিন্দা।

কবি ও বিভূতিভূষণের কথার উক্তিতে বোঝা যায় যে জগতে বহু ঘটনা ঘটে ও অনেক জিনিসই বিরাজমান কিন্তু আমরা সেই ধারণাগুলি সম্পর্কে অবগত নই। অনেক সময়ই তা জানবার চেষ্ঠাও হয়ত করি না। বাস্তবে আমাদের চোখে দেখার বাইরেও তো গ্রহ নক্ষত্রদের উপস্থিতি রয়েছে কতটুকুই বা আমরা তা জানি।

ভূত চরিত্র কেবল বাঙালিসমাজ নয়, মানবসমাজেরও প্রতিনিধিত্ব করে। কারণ সাধারণ মানবিক দোষগুণ ও বিশিষ্টতাই এদের চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরাম বাঙালি পাঠক সমাজ কে খাতির করেন নি, রঙ্গ-ব্যঙ্গ করেছেন, দরকারমত কষাঘাত করছেন। তবুও আমরা তাঁদের দূরে ঠেলতে পারি নি। কারণ তাঁরা যে-ভূমিতে দাঁড়িয়ে চাবুক হাঁকড়েছেন, তা হ'ল সত্যের ভূমি। এই সত্যনিষ্ঠা আর সমাজকল্যাণেচ্ছা তাঁদের লেখায় সঞ্চারিত করেছে বিশ্বাসের জোর। সব রকম ভণ্ডামি ন্যাকামি অন্যায়

অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁদের লড়াই। সে লড়াইয়ে তাঁদের প্রধান অস্ত্র রঙ্গ-ব্যঙ্গ কৌতুকের তুলিকা। তাই তাঁদের গল্পে ব্যঙ্গ হয়েছে সরস, সমালোচনা হয়েছে কৌতুকপূর্ণ; সমাজের দোষ দেখিয়ে তারা সমাজকল্যাণ করতে চেয়েছেন। সমাজ-সংস্কারক যখন সাহিত্যিক হয়ে দেখা দেন তখন তাঁর সংস্কার-প্রয়াসের পিছনে থাকে না কোনো তিক্ততা বা অভিসন্ধি, থাকে না ব্যক্তিস্বার্থ বা আত্মাভিমান, থাকে গভীর মমতা আর প্রবল সহৃদয়তা। সাহিত্যিক হিসেবেই তাঁর পরিচয় নয়; তিনি জীবনের শিল্পী। উনিশ শতকে ত্রৈলোক্যনাথ যে ধরনের ভূতেদের তাঁর রচনার মধ্যে এনেছেন তার চেহারা বিশ শতকে পরশুরামের লেখায় আরও মজার কৌতুকাবহ আকার ধারণ করেছে । 'ভূত' আছে কি নেই ? এ নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে সেই প্রসঙ্গ আলোচনা করা গবেষণার উদ্দেশ্য নয়। বাংলা সাহিত্যে সময়ের দীর্ঘ প্রবাহমানতায় ত্রৈলোক্যনাথের রচনা থেকে শুরু করে পশুরামের রচনা পর্যন্ত ভৌতিক গল্পের পরম্পরা অনুসন্ধানের বিষয়।

প্রথম অধ্যায়

১) ক. পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সাহিত্যে ভূতের প্রসঙ্গ

অলৌকিক কাহিনীর প্রতি মানুষের আকর্ষণ সহজাত। এর কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায় এর জড়টি রয়েছে মানবমনের গোপনতম ও গভীরতম অন্দরমহলে। প্রাচীন যুগে প্রাকৃতিক জগতই মানুষের কাছে ভয়ের বিষয় ছিল আর একটি ছিল ধর্ম ও অন্ধ-কুসংস্কার। কিন্তু সভ্যতা যখন সামনের দিকে এগিয়েছে তখন বিজ্ঞানভিত্তিক যুগে নানান যুক্তির আলোকে কুসংস্কারের কুয়াশা অনেক কমেছে বলা চলে। অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে যখন জোর কদমে বিজ্ঞান ও যুক্তি বুদ্ধির চর্চা শুরু হয় তখনও সেই সমাজে ডাইনী সন্দেহে জনতার অবিচারে একজন বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাকে অমানবিকভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। আর প্রাচ্য দেশগুলির কথা না বললেই নয়। এখনও একবিংশ শতকের যুগে বাস করেও আমাদের দেশে এই সমস্যা বহাল আছে। অন্ধকার ও কুসংস্কারের যুগ অতিক্রম করে মানুষ ভৌতিক সাহিত্য রচনায় হাত দিয়েছে এবং মানুষের কুসংস্কার ও বিভিন্ন জপ-তপ, তন্ত্র-মন্ত্র যা প্রাচীনযুগে অধিক প্রচলিত ছিল তা সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান রসদ যুগিয়েছে।

প্রাচীন যুগে দেখা যায় দেব-দেবীদের বিগ্রহ রচনায় একটা বীভৎসতার দেখা যায়। মিশরের দেবদেবীর শারীরিক ভঙ্গী লক্ষনীয়। আবার কখনও ইষ্ট দেবতাকে খুশি করবার জন্য পশুবলী এবং কোথাও কোথাও নরবলীও করা হত। অনেক দেবতাদের আচরণ রাজাদের মতো। কারও প্রতি অপ্রসন্ন হলে তারা ক্ষমাহীন ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির। প্রসঙ্গত, ভারতীয় কালীমূর্তি ও শিবের রুদ্রভাবের কথা বলা যায়। এই সমস্ত বীভৎসতার ভাব ও কল্পনাগুলি

মানুষের মনে আদিকালপর্ব থেকেই বাসা বাঁধে যা ধীরে ধীরে বিভিন্ন গল্পকথায়, রূপকথায় ছড়িয়ে পড়ে। সময় ভেদে, জাতি ভেদে, স্থান ভেদে এই কল্পনা বা বিষয় গুলি নানা রূপ পেতে থাকে। এইভাবেই সভ্যতার বিকাশের অনেককাল পরে মানুষ যখন ক্রমে ভয়কে জয় করতে শিখল এবং ভয় পাওয়ার বাসনা অনুভব করল সেই তাগিদেই ভৌতিক ও কল্পকাহিনি গুলি সৃষ্টি হতে শুরু করে।

ইংরেজিতে 'ঘোস্ট' শব্দটি প্রাচীন ইংরেজি 'গাস্ট' থেকে উদ্ধৃত। ল্যাটিনে 'স্পিরিটাস' শব্দটির অর্থ হল শ্বাস বা জোরে জোরে বাতাস ত্যাগ করা। ভূত নিয়ে পৃথিবীর সারা প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে নানান লেখা হয়েছে। কখনও তা মৌখিক গল্প কথার পরম্পরায় চলে এসেছে আবার কখনও তা হয়েছে বিভিন্ন কাব্য, নাটক, ধর্মগ্রন্থ, রম্যরচনায়, গল্প ও উপন্যাসের বিষয়বস্তু। সব সমাজেরই একটা গল্পের প্রবণতা থাকে। যার ফলে সাহিত্যে সেই ভাব গুলিই ধরা পড়ে।

প্রাচীন কবি হোমারের(আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী) 'ওডিসি' কাব্যে সম্ভবত প্রথম ভূতের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। সেখানে যুদ্ধের সময়ে নায়ক মৃত্যু ও ভূতদের মুখোমুখি হয়। খ্রিষ্টানদের ধর্ম গ্রন্থে 'বাইবেল'-এর 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'- এ দেখা যায় এন্ডরের জাদুকরী নবী স্যামুয়েলের আত্মাকে ডেকে আনে। রোমান লেখক প্লুতাস (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৫৪-১৮৪) 'মস্তেলারিয়া' (দ্য হন্টেড হাউস) নামে একটি ল্যাটিন নাটক লিখেছিলেন। প্লিনি দ্য ইয়াঙ্গার (৬১- খ্রিস্টপূর্ব ১১৩) এথেন্সের এমনই একটি বাড়ির বর্ণনা করেছেন যেখানে শৃঙ্খলে আবদ্ধ রয়েছে একটি ভূত । এই আর্কাইপটি পরবর্তীকালে সাহিত্যে পরিচিতি হয়ে উঠবে।

মধ্যযুগে জার্মানিতে লোকশ্রুতির একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যা werewolf নামে পরিচিত। একটি মানুষ সারাদিন সুস্থ সহজ মানুষের মতো আচরণ করে কিন্তু রাতের অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে জেগে ওঠে রক্তলোলুপতা, লালসার তীব্র আকাঙ্ক্ষা যা এক ভয়ানক উত্তেজনার সৃষ্টি করে। যখন তার মনে এই ভাবের আগমন হয় তখন তার মধ্যে শারীরিক পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করে। মধ্যযুগে ইউরোপে নেকড়ের অত্যাচার এবং ডাইনী ও পিশাচসিদ্ধের যে কোনও জন্তু বা পশুতে রূপান্তরিত করতে পারার ক্ষমতায় সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ছিল। এই সমস্ত লোকশ্রুতি গুলিও ভারতেও খুবই প্রচলিত ছিল। জার্মানিতে werewolf এর কল্পনাটি অন্যান্য দেশে অপরাপর যে রূপ পেয়েছে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হল- আইসল্যাণ্ডে Berserkr, আফ্রিকায় Hyena-man, বলকানে cat-woman, উত্তর আমেরিকায় রেড ইন্ডিয়ান্দের werebison এবং আমাদের দেশে বাঘ-মানুষ।

ইংরেজি সাহিত্যে ভূতের গল্প একটা গুরুত্বপূর্ণ আসনলাভ করতে পেরেছে। ইংরেজি সাহিত্যে প্রায় সব রকম সাহিত্যিকই ভৌতিক ও লৌকিক উপাদান নিয়ে গল্প রচনা করেছেন। নবজাগরণের পর্বের এলিজাবেথিয় যুগে উইলিয়াম শেক্সপিয়র(১৫৬৪-১৬১৬) তাঁর কিছু নাটকে ভৌতিক পরিবেশের অবতারনা করেছেন। 'হ্যামলেট'(১৬০৩) নাটকের কাহিনিতে তিনি এনেছেন হ্যামলেটের মৃত পিতার ভূত বা আত্মার ছায়াকে। শেক্সপিয়রের 'ম্যাকবেথ' (১৬০৬-১৬০৭) নাটকেও ভূতের উপস্থিতি রয়েছে। বাঙ্কুয়কে হত্যার পর সে ভূত হয়ে এসেছে। শেক্সপিয়রের প্রধান ট্র্যাজিডি গুলির মধ্যে একাধিকবার ভৌতিক চরিত্রের প্রকাশ ঘটেছে। অনেক সময়ই দেখা যায় নাটকের ট্র্যাজিক পরিণতির জন্য মূলত ওইসব ভৌতিক চরিত্রই দায়ী। কোলরিজের স্বল্প সাহিত্য সম্ভারের মধ্যে পুরো দুখানা বড় কবিতা- Rime of the Ancient Mariner(১৭৭৪) এবং christabel(১৮১৬) অলৌকিক উপাদান আশ্রয় করে

রচিত। শেক্সপিয়রের নাটককে তাই বলে ভৌতিক নাটক বলা যায় না। তিনি কাহিনির প্রবহমানতায় এই ভূতগুলির উপস্থাপনা করেছেন ।

ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকে সব প্রধান প্রধান ইংরেজ এবং আমেরিকান লেখকরা ভৌতিক বা অলৌকিক কাহিনি রচনা করেছেন,- যথা চার্লস ডিকেন্স, আর. এল. স্টিভেনসন, এডগার এলেন পো, হেনরি জেমস, রুডিয়ার্ড কিপলিং, এইচ. জি. ওয়েলস, ওয়ালটার ডি লা মেয়ার, উইলিয়াম ফকনার, উইলিয়াম স্যামসন প্রভৃতি। শুধু ভূতের গল্প লিখে যারা আসর জমিয়েছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন এম. আর. জেমস, অ্যালগারনন ব্ল্যাকউড, এল. পি. হার্টলি, মারিয়ন ক্রুফোর্ড, ব্রাম ষ্টোকার প্রভৃতি। ইংরেজি, মার্কিন, ফরাসী এবং অন্যান্য যে সব ইউরোপীয় সাহিত্যের সাহিত্যিকদের নাম দেওয়া হয়েছে তাদের এই ভৌতিক কাহিনি গুলি আকৃষ্ট করেছে এত ভিন্ন ভিন্ন দেশ কালের মধ্যে থেকেও। বাস্তব এবং অবাস্তব অথবা অলৌকিকের আদর্শ সংমিশ্রণ না হলে ভালো ভূতের গল্প সৃষ্টি হয় না। বাস্তব জগতে ভূতের পরিচয় পাওয়া যায় না। এবং অন্যদিকে বিশুদ্ধ অবাস্তবকে উপজীব্য করে শিশুমনোরঞ্জনকারী রূপকথা রচনা করা যায় মাত্র। তাহলে বলতে পারা যায় যে অলৌকিক কাহিনি রচনায় লেখকের প্রধান যোগ্যতা হল পরিমিতি বোধ এবং কল্পনার প্রসার।

অলৌকিক কাহিনি সেইগুলিই যেখানে ভৌতিক সত্ত্বা বা অলৌকিক বিষয় থাক বা না থাক কাহিনীর পটভূমি এবং আবহাওয়া ভৌতিক সম্ভবনায় পরিপূর্ণ। বলাবাহুল্য যে ভৌতিক গল্পের উদ্দ্যেশ্য ভয় দেখানো বা ভয় পাওয়ানো। ভৌতিক গল্পকার তার কল্পনার প্রসার, অনুভূতি বোধ, এবং বাস্তব জগত থেকে উপাদান নিয়ে এইসব কাহিনি রচনা করে থাকেন।

'Renaissance Clothing and the Materials of Memory'(2000) বইতে এন রসালিন্ড জোন্স ও পিটার স্ট্যালিব্রাস(Ann Rosalind Jones & Peter Stallybrass) দেখিয়েছেন যে, ইংরেজি রেনেসাঁ থিয়েটারে জীবিত আকারে ও মানুষের রক্ষাকবচ হিসেবে দেখানো হয়েছে। অষ্টাদশ শতকে থিয়েটারে আঁকা এই ভূত গুলি উপহাস ও মনোরঞ্জনের বস্তু হয়ে উঠেছিল। এই ভূত গুলিকে মঞ্চে হাসির খোরাক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল কিন্তু আসলে লক্ষ্য ছিল মঞ্চে একটা ভৌতিক আবহের সৃষ্টি। জোন্স এবং স্ট্যালিব্রাস পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, ঐতিহাসিক পর্যায়ে ভূতেরা ধীরে ধীরে মানুষের কাছে অবিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে, অন্তত বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী শিক্ষিত অভিজাতদের কাছে। তাদের ভূতে না বিশ্বাস করার প্রবণতার প্রতিবাদ করার উদ্দ্যেশেই হয়ত এই ভূতগুলি সাহিত্যে বেশি মাত্রাই ধরা পড়েছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড সীমান্ত প্রদেশে 'Border Ballads' নামে একধরনের পালাগান প্রচলন ছিল। সেগুলি হল- 'The Unquiet Grave', 'The wife of Usher's Well' ও 'Sweet william's Ghost' এই সমস্ত পালাগানের মূল বিষয়বস্তু ছিল মৃত ব্যক্তি, আত্মা ও ভূত । উনিশ শতকের শুরুতে জার্মানিতে হেনরিক ভন ক্লিষ্ট (১৭৭৭-১৮১১) 'দ্য বেগার উইমেন অফ লোকার্নো' (১৮০৮ খ্রিঃ) নামে ভূতের গল্প রচনা করেন। আধুনিক ছোটগল্পের সূচনার যুগে প্রুশিয়ায় আরনেস্ট থিয়োডর অ্যামাডেন্স হফমেন (১৭৭৬-১৮২২) ফ্যান্টাসি জাতীয় জাঁর এর রচনা লিখবেন- 'দ্য এলিমেন্টারি স্পিরিট' ও 'দ্য মাইন্স অফ ফালুন' এই ফ্যান্টাসি গল্পে ভূতের প্রাধান্য রয়েছে। ১৮৩০ –এর দশকে রাশিয়ান সাহিত্যিক নিকলাই গোগল (১৮০৯-১৮৫২) 'দ্য ভিই' (১৮৩৫) ও আলেকজেন্ডার পুস্কিন (১৭৯৯-১৮৩৭) 'দ্য কুইন অফ স্পেডস' ভূতের গল্পের জাঁর এর পরিপক্কভাবে সূচনা করছেন।

রোমান্টিক যুগে ইংল্যান্ডে হোরেস ওয়ালপোল (১৭১৭-১৭৯৭) 'দ্য ক্যাসেল অফ ওটরেন্ট' ('The Castle of Otranto'- ১৭৬৪ খ্রিঃ) নামে প্রথম একটি গথিক উপন্যাস লেখেন, যেখানে তিনি অলৌকিক উপাদানের জগত ও ভূতের আবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন। উনিশ শতকে যে সমস্ত ভূতের গল্প রচনা করা হয়েছে সেগুলির বেশিরভাগই গথিক উপন্যাস বা নবেল থেকে গ্রহনীয়। গথিক উপন্যাসের মূল অবলম্বন ছিল অলৌকিক, রহস্যময়তা, সংশয় এবং সন্দেহের জটিলতা, ভয় ও উত্তেজনার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। ভীতিরস পরিবেশন করায় এই শ্রেনীর উপন্যাসের মূল লক্ষ্য ছিল। গথিক উপন্যাসের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনাকার হলেন হোরেস অয়াল্পোল। তাঁর The Castle of Otranto খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। আর সাহিত্যের এই নতুন জাঁর এর প্রতি বহু লেখক আকৃষ্ট হয়েছিলন।

অলৌকিক কাহিনির ইতিহাসে নবযুগের সূত্রপাত করলেন আমেরিকার লেখক এডগার এলেন পো। এই সময় কালপর্বেই আমেরিকান লেখক এডগার এলেন পো (১৮০৯-১৮৪৯) ও সেরিডান লে ফানু (১৮১৪-১৮৭৩) ছোটগল্পের রীতিকে পূর্ণ পরিণতি দিয়ে তার সূচনা করেন। পো প্রধানত কবি। পরবর্তীকালে ইয়েট্স তাকে 'greatest lyricist' বলে স্বীকার করেছিলেন। পো লিখছেন- 'দ্য মস্ক্ অফ দ্য রেড ডেথ'। পোর গল্পগুলি প্রচলিত অর্থে হয়ত অলৌকিক কাহিনি না হতে পারে তবে তাঁর অনুভূতি বোধ এবং কল্পনার প্রসার তাঁর রচনাতে ভিন্নতর মাত্রা যুগিয়েছে।

আইরিশ লেখক লে ফানু এই শতাব্দীর অষ্টম-নবম দশকের দিকে ভূতের গল্প গুলিকে জনপ্রিয় করে তোলেন, 'ইন এ গ্লাস ডার্কলি' ও 'দ্য পার্সেল পেপার' প্রভৃতি। আফ্রিকায় যে Vampire এর কল্পনা প্রচলিত ছিল সেই জাঁর–এর কাহিনিও লে ফানু লিখেছেন-

'Carmilla'. আরও কিছু গল্পকার ভূতের গল্পের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যায় তাঁরা হলেন- এম আর জেমস, ভায়লেত হান্ট ও হেনরি জেমস । তাঁদের ভূতের গল্পগুলি বেশির ভাগই প্রাচীন গথিক উপন্যাস ও লোককথা থেকে সংগৃহীত। গথিক হল একটি বর্বর সম্প্রদায়, যাদের সমাজে অসভ্য জাতি হিসেবে পরিচিতি ছিল। এদের সংস্কৃতিতে নানা রকমের তন্ত্রমন্ত্র , ভূত-প্রেত, কুসংস্কার প্রচলিত ছিল।

ভিক্টোরিয়া যুগে চার্লস ডিকেন্স (১৮১২-১৮৭০) রচনা করলেন 'এ খ্রিস্টমাস কেরল' ও 'দ্য সিগনাল ম্যান' নামক জনপ্রিয় ভৌতিক গল্প। ব্রিটিশ ও জার্মানি সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঊনবিংশ শতকে আমেরিকা নিজেদের ঘরানার ভৌতিক সাহিত্য প্রস্তুত করতে শুরু করে। ওয়াশিংটন ইরভিং(১৭৮৩-১৮৫৯) জার্মানি লোককাহিনী থেকে গল্প সংগ্রহ করে 'দ্য লেজেন্ড অফ দ্য স্লিপি হলো'(১৮২০) নামে ভৌতিক কাহিনি লেখেন। আমেরিকান সাহিত্যিক এডগার এলেন পো- ও এই ধরনের কিছু ভৌতিক গল্প লিখেছিলেন- 'দ্য মস্ক অফ দ্য রেড ডেথ' ও 'মরেল্লা'। এই শতকেই আরও বেশ কিছু আমেরিকান গল্পকার ভূতের গল্প লিখছেন। তাঁরা হলেন- এডিথ অয়ারটন, মেরি ই উইলকিন্স ফ্রিম্যান, হেনরি জেমস। আমেরিকায় 'পাল্প ম্যাগাজিন' পত্রিকা ভূতের গল্পের প্রকাশে এগিয়ে আসে। অপেরা ও কৌতুকধর্মী লেখাতেও পরবর্তীকালে ভূত, পরী প্রভৃতি অলৌকিক অনুষঙ্গ স্থান পেতে শুরু করে। অস্কার তেলেগ্মান এর অপেরার গানেও ভূতেদের পাওয়া যায়। অস্কার ওয়াইল্ড ১৮৮৭ সালে 'দ্য কেন্টারভেলি ঘোস্ট' নামে একটি কমিক ধর্মী ভূতের গল্পের রচনা করেছেন। ১৯২৬ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে আমেরিকায় ভূতের গল্প গুলি মাগাজিন বা পত্রিকায় বেশি ছাপা হয়। পরবর্তীতে এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এম আর জেমস, ফ্রিতজ লিবার, শারলি জ্যাকসন, র‍্যামসি ক্যাম্পবেল ও আরও অনেকে।

প্রাচ্যে ‘আরব্য রজনী’র গল্পে জিন-পিশাচের পরিচয় পাওয়া যায়। লাফকাডিয় হার্ন জাপানের লৌকিক কাহিনি গুলিকে সংগ্রহ করে ‘Kwaidan: stories and studies of strange things’ নামে ১৯০৪ সালে সম্পাদনা করেন। যে কাহিনি গুলিতে বলা হয়েছে কাইডেন নামে ভূত প্রচলিত ছিল জাপানের লোককথায়। প্রাচ্যে অনেক ধর্ম গ্রন্থে ভূতের উল্লখ আছে। আর্য ও শবর জাতির মধ্যেও ভূতের মন্ত্রতন্ত্রের প্রচলন ছিল তার প্রমান পাওয়া যায় ‘অথর্ববেদে’। হিন্দু পুরানেও ভুত-প্রেত, রাক্ষস, দানব এর উপস্থিতি ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলায় লোককথা ও মৌখিক গল্পকথার উপর ভিত্তি করে নানান ধরনের ভৌতিক ও রাক্ষস-খোক্কস এর মত ফ্যান্টাসি জাতীয় গল্প প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যে ভূতের সমাবেশ ঘটেছে।

ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরামের গল্পে ভূতের ধারাকে বোঝার আগে দেখতে হবে মধ্যযুগের সাহিত্য মঙ্গলকাব্য গুলিতে ভূতের প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ‘‘চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে’’ ‘দক্ষযজ্ঞভঙ্গ’ নামক অংশে কবি লিখেছেন-

“দামামা দগড় বাজে বিয়াল্লিশ বাজনা।
সঙ্গে ষোলকোটি ধায় প্রেতভূত দানা।।
দানাগণের কোলাহলে কিছুই না শুনি।
আচ্ছাদিত ধূলাতে হইল দিনমণি।।”[১]

দক্ষযজ্ঞে সতী শিবের নিন্দা শুনে দেহ ত্যাগ করেছেন। তাই শিব ক্রুদ্ধ হয়ে যজ্ঞ নাশ করার জন্য ষোলো কোটি ভূত পাঠায় । এই সকল ভূত সচরাচর কারোর ক্ষতি করে না তা স্বত্বেও ভূত বলতে একটা অশুভ শক্তির কল্পনা মনের মধ্যে উদয় হয়। কিন্তু একটু খেয়াল করলে

দেখা যাবে যে এই মঙ্গলকাব্য গুলিতে ভূত হল শিবের সহচর । তাই সতীর দেহত্যাগে ক্রুদ্ধ হয়ে দক্ষের প্রাণ নিতে যায় তারা। ভূত হলেও এদের আচরণ অনেকাংশে মানুষের মতোই। অলৌকিক শক্তি বা জাদু এরা প্রয়োগ করছে না । তারা ব্রাহ্মণের পুথি কেড়ে নিয়ে তাদের হাত বেঁধে দিচ্ছে, কারোর দাড়ি উৎপাটন করছে ,দাঁত ভেঙ্গে দিয়ে বসন ছিঁড়ে দিয়ে একেবারে তুমুল কাণ্ড বাঁধিয়ে তুলেছে ।

"ধরিয়া সে রণে তুরঙ্গ চরণে
মাথায় তুলি দেই নাড়া
অঙ্গ ছিঁড়িল তুরঙ্গ পড়িল
হাতেতে রহিল ফড়া।।"[২]

মঙ্গলকাব্যে ভূত মূলত শিবের সঙ্গী। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কব্যেও দেখা যায় এরা শিবের সঙ্গে চলেছে দক্ষযজ্ঞ নাশ করতে তাদের পদধ্বনিতে চারিদিকে ভূমিকম্প হচ্ছে। ব্রাহ্মণ দেখা মাত্রই ভূতেরা তাদের লাথি কিল মারছে। রাজ্যে তুমুল কোলাহল বাঁধিয়ে তুলেছে –

"রাজ্য খণ্ড লন্ড ভন্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে ।
হূল থূল কূল কূল ব্রহ্মাডিম্ব ফুটিছে।।"[৩]

ভূতের শিব কেন্দ্রিকতা অনেকাংশে অন্নদামঙ্গলের 'দিল্লীতে উৎপাত' নামক অংশে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। বাদশাহের দেবতা নিন্দায় অন্নপূর্ণা তাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য সৈন্য বাহিনী নিয়ে বাদশাহের ওপর আক্রমণ করেন । অন্নপূর্ণার সৈন্য বাহিনীতে রয়েছে ডাকিনী, যোগিনী, শাঁকিনী, পেত্নী, দানব, রাক্ষস, খোক্কশ ইত্যাদি। এদের দাপটে দিল্লী থরথর করে

কাঁপে। আঁচড়ে কামড়ে তারা সমস্ত যবন সেনার রক্তপাত ঘটিয়ে চলেছে। রথ গুলিকে দাঁত দিয়ে গুড়ো করে দিচ্ছে। এই প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের উক্তি-

"এইরুপে দিল্লীতে পড়িল মহামার ।
যবনের হাহাকার ভূতের হুঙ্কার ।।"[৪]

শহরের প্রত্যেকটি ঘরে ভূতাগত। ওঝা ভূত ছাড়াতে এলে বিবির সঙ্গে ভূতের উৎপাত আরো শুরু হয়ে যায় । এইভাবে পুরো শহরে ভূতের উৎপাত ঘটিয়েও অন্নদা ক্ষান্ত হন নি । শহরের সব খাদ্য তিনি হরণ করে নেন। 'খবিশ' (এক ধরণের ভূত) ছাড়ানোর জন্য ওঝা তাবিজ দেন কিন্তু ভূত সেই তাবিজ ছিঁড়ে ফেলে ওঝাকে পেটায় । অন্যান্য মঙ্গলকাব্য বিশেষ করে শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্যে ভূতেদের উৎপাত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দক্ষযজ্ঞ কেন্দ্রিক। কিন্তু অন্নদামঙ্গলে সে ক্ষেত্রে নতুনত্ব দেখা যায় , ভারতচন্দ্র বলেন –

"ভারত কহিছে ভূতনাথের এ ভূত।
খবিশের খবিশ যমের যমদূত ।।"[৫]

মধ্যযুগের সাহিত্য কাল ধারা অবসানের পর মুদ্রিত সাহিত্য আবির্ভাবের ফলে বাংলা গদ্য, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রভৃতির সূচনা হয়। এই সব আধুনিক সাহিত্যেও এই ভূত-প্রেত বা অলৌকিক বিষয়কে সাহিত্যিকরা এড়িয়ে যেতে পারেননি। তাই উনিশ-বিশ তাঁদের শতকের আধুনিক সাহিত্যে ভৌতিক পরিবেশ উল্লেখযোগ্য আসন লাভ করেছে।

তথ্যপঞ্জি

১) শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী (সম্পা), *কবিকঙ্কন-চন্ডী*, কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২, পৃ. ৬২।

২) তদেব, পৃ. ৬৩ ।

৩) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা), *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী*, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পঞ্চম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪২১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৬ ।

৪) তদেব, পৃ. ৩৯১ ।

৫) তদেব, পৃ. ৩৯২ ।

১) খ. বাংলা ছোটগল্পের সূচনাপর্বে ভূত ও ভৌতিক প্রতিবেশ

ছোটগল্পের জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীতে। ইতিহাসগত দিক থেকে ছোটগল্পের সূচনা ইউরোপে প্রথমে হয়নি, হয়েছে উত্তর আমেরিকায়। এডগার এলেন পো' র 'ম্যানুসক্রিপ্ট ফাউন্ড ইন এ বটল' গল্পের মাধ্যমে ও ইউরোপের রুশ শিল্পী গোগল ছোটগল্পের কলাকৃতিকে প্রথম পরিণতি দিলেন। ওয়াশিংটন ইরভিং থেকে পো, গোগোল এর কাল পর্যন্ত পাশ্চাত্য পৃথিবীতে অসংখ্য ছোটগল্প এবং গল্প লেখকের অভ্যুদয় ঘটেছে। ছোটগল্প রচনার প্রথম পর্যায়ে এঁদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমেরিকায় ছোট আকারের গল্প লেখার এক নূতন তাগিত দেখা দিয়েছিল অজস্র প্রকাশিত সাময়িক সাহিত্য পত্রিকার সাহায্যে। বাংলা সাহিত্যেও ছোটগল্পের প্রথম অসচেতন বিকাশ সাময়িক সাহিত্য পত্রিকার পথ বেয়ে। বাংলা ভাষায় সাহিত্য-সাময়িক হিসেবে 'বঙ্গদর্শন' কেবল নূতন যুগের পথিকৃৎই নয়; নবজীবনের ধারা বাহকও। ১২৭৯ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শনে'র প্রকাশ বাঙ্গালির রস-বাসনা ও জ্ঞান পিপাসার ক্ষেত্রে এক বৈশিষ্টের সূচনা করেছিল। 'ভারতী', 'সাধনা', 'হিতবাদী', 'নবজীবন', 'সাহিত্য' ইত্যাদি উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পত্রিকার প্রবাহটি 'বঙ্গদর্শনে'র জীবন প্রেরণারই উৎসজাত।

'মধুমতী'(১৮৭৪) নামে যে গল্প লেখার প্রয়াস করেছিলেন বঙ্কিম সহোদর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়(১৮৪৮-১৯২২)। কিন্তু 'বঙ্গদর্শনে' রচনাটিকে উপন্যাস হিসেবে পরিচিত করা হয়েছে। 'মধুমতী'র পরেই বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)-এর লেখা 'ভিখারিনী' গল্পটি ১২৮৪ বাংলা সালের 'ভারতী' পত্রিকায় (শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা) প্রকাশিত হয়।

উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে বাংলা ছোটগল্পের সূচনালগ্নে বেশ কিছু সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিকের লেখায় ভৌতিক পরিবেশ পরিলক্ষিত হয়। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন- কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (১৮২০-১৮৫৫), যোগীন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৪-১৯২৭), উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫), গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী, প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৫-১৯৪৬), দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়।

'প্রেতের আতিথ্য' গল্পের লেখক হলেন কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (১৮২০-১৮৫৫)। এর প্রথম প্রকাশকাল ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ। গল্পটি লেখকের আত্মকাহিনি থেকে নেওয়া। চিরাচরিত ভয়ানক আকারে এই গল্প রচিত। এই গল্পে কথক আর একজনের কাছ থেকে গল্প ভূত সম্পর্কিত তার পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছেন। গল্পটির স্থান মুর্শিদাবাদ কাশিমবাজার এলাকা। এই গল্পে একজন ব্যক্তি পথভ্রান্ত হয়ে রাত্রি যাপনের জন্য কাশিমবাজার এলাকায় উপস্থিত হয়। ওই এলাকায় যে মাঝে মাঝে ভূতের উপদ্রব হয় এই জনরব প্রচলিত থাকা সত্বেও উপায় না পেয়ে পথভ্রান্ত পথিক রাত্রি যাপনের একটি বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সেই বাড়িটিতে সে কোনও ব্যক্তিকে দেখতে পায় না। শুধু এক কণ্ঠস্বর বাড়ির ভেতর থেকে আসে ও তাকে বাড়িতে আশ্রয় নিতে বলে। খাবার সময় হলে পথিককে দিয়েই রন্ধন করিয়ে নেয়। ও নিজে খায় কিন্তু তাও সে দেখা দেয় না। অনেক পরে কথকের মনে সন্দেহ হতে থাকে সে সত্যি সত্যি ভূতের খপ্পরে পড়েছে। এমন সময় একটা কণ্ঠস্বর সে শুনতে পায়-

> "তুমি যাহা ভাবিতেছ তাহা ঠিক, কিন্তু তুমি আমার কথা শুনিলে তোমার কোন বিপদ হইবে না। পরমান্ন একপাত্র রোয়াকে রাখিয়া দাও, দ্বিতীয় পাত্র তুমি খাও, ইহা না করিলে তোমার বিপদ ঘটিবে।"[১]

এই গল্পে ভূত দিনের বেলাতেও উপস্থিত হয়েছে। কাহিনির মাধ্যমে জানা যায় এক অতৃপ্ত আত্মার অন্ত্যষ্টি ক্রিয়া না হওয়ার কারণে ইহজগত থেকে তার মুক্তি ঘটেনি। শেষে ভূত পথিককে অনুরোধ করে তার ভাই যেন গয়ায় পিন্ডদান করে।

উনবিংশ শতকে বঙ্কিমের লেখায় আমরা ভূত পেলাম না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) 'নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী' নামে একটি ভৌতিক রচনা লিখতে শুরু করেছিলেন; তিনি তা সম্পূর্ণ করতে পারেননি। এখানে বঙ্কিমের লেখার অংশ দেওয়া হল-

> "ভাল, সারি, সত্য বল দেখি, তোমার বিশ্বাস কি? ভূত আছে?
>
> বরদা, ছোট ভাই সারদাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। সন্ধ্যার পর, টেবিলে দুই ভাই খাইতেছিল। একটু রোষ্ট মটন প্লেটে করিয়া ছুরি কাঁটা দিয়া তৎসহিত খেলা করিতে করিতে জ্যেষ্ট বরদা এই কথা কনিষ্টকে জিজ্ঞাসা করিল। সারদা প্রথমে উত্তর না করিয়া এক টুকরো রোষ্টে উত্তম করিয়া মাষ্টার্ড মাখাইয়া বদন মধ্যে প্রেরণ পূর্ব্বক আধখানা আলুকে তৎসহবাসে প্রেরণ করিয়া একটু রুটি ভাঙ্গিয়া বাম হস্তে রক্ষা পূর্ব্বক অগ্রজের মুখপানে চাহিতে চাহিতে চর্ব্বণ কার্য্য সমাপন করিল। পরে একটু সেরি দিয়া গলাটা ভিজাইয়া লইয়া বলিল "ভূত? না।"...এই বলিয়া বরদা আর কিছু মটন কাটিয়া ভ্রাতার প্লেটে ফেলিয়া দিলেন। সারদা অবচলিত-চিত্তে তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিল, তখন বরদা বলিল "Seriously সারি! ভূত আছে বিশ্বাস কর না?"[২]

এই অব্দি বঙ্কিমের লেখা বলা হয়ে থাকে। তাঁর এই কাহিনিটিকে পরবর্তীকালে শরচ্চন্দ্র ঘোষাল ও প্রমথনাথ বিশী আলাদা আলাদা রূপ দিয়ে সম্পূর্ণ করেন।

রাজনারায়ন বসুর পুত্র যোগীন্দ্রনাথ বসু 'ভারতী' পত্রিকাতে (ভাদ্র ১২৯৩) ১৮৮৬ সালে একটি প্রবন্ধ লেখেন যার নাম 'দেওঘরে অদ্ভুত ঘটনা'। এই প্রবন্ধেও ভৌতিক ঘটনার

খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যায়। উনিশ শতকের সময়কালে এই প্রবন্ধ লেখার মাধ্যমে বোঝা যায় যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির মনে ভূততত্ত্ব বিষয় নিয়ে কৌতূহল নবমাত্রা লাভ করে। এই প্রবন্ধে শুধু ভৌতিক পরিবেশই নেই তার সঙ্গে সঙ্গে ভৌতিক ঘটনাও ঘটেছে। যা সাধারনত মানব জীবনে ঘটতে পারে না। প্রবন্ধটি জুড়ে সে ঘটনা ঘটে যাচ্ছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কারণ বা উৎস খুঁজে পাওয়া যায়নি । তাছাড়া তার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দেওয়া যায় না।

> "ঘরের চারিদিক বন্ধ ঘরে যে কজন আছেন সকলেই নিস্পন্দ হইয়া দণ্ডায়মান, তথাপি ফল পড়ে কোথা হইতে, ইহার কিছুই ঠিকানা করিতে না পারিয়া ক্রমে আমাদের মনে ভূতের ভয় আস্তে আস্তে জাগিয়া উঠিতেছিল।"[৩]

ক্রমাগত তিনদিন রাত দশটার আগে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ঘরে দেশি-বিদেশি চেনা-অচেনা নানারকম ফল ওপর থেকে মেঝেতে পড়তে থাকে। দশটার পর পড়া বন্ধ হয়ে যায়। তার যে ফল গুলি পড়েছিল পরমুহূর্তে তা উধাও হয়ে যায়-

> " 'ড' চিহ্নিত স্থানের প্রতি চাহিয়া সেখানে কিছুই নাই দেখিয়া স্তম্ভিতা হইয়া মা বলিলেন-'একি হল আমি এইমাত্র এখানে একটি কালো বর্ণের জিনিষ পড়তে দেখে গিয়েছি'।"[৪]

ভূত সম্পর্কিত মানুষের সংস্কারের উল্লেখ করে প্রবন্ধকার বলেন যে তিনি শুনেছেন যেখানে ঈশ্বরের নাম উচ্চারিত হয় সেখানে ভূতেরা উপদ্রব করতে পারে না । তাই 'ঘ' চিহ্নিত এবং 'চ' ও 'ছ' চিহ্নিত ঘরে ঠাকুরের উপাসনা হত, ভূতেদের উপদ্রব থেকে সেইগুলি বেঁচে ছিল এবং এই সকল ঘটনা যে ভৌতিক তা গ্রন্থকার শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে বলেছেন যে-

> "যে ব্যাপার বর্ণনা করিলাম তাহা যে ভৌতিক ব্যাপার তাহা আমরা আজও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না, তবে যেরূপ অনুসন্ধান করা হইয়াছিল তাহাতে উহা ভৌতিক ব্যাপার ভিন্ন আর কিছু হওয়ার বড়ই কম সম্ভাবনা। ইহায় আমাদিগের সংস্কার।"[৫]

বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ত 'নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী' নামক কাহিনি শুনেছিলেন যার ফল স্বরূপ তিনি লিখলেন 'বঙ্কিমের অভিজ্ঞতা' নামক গল্প। এই গল্পটি 'সমালোচনী' পত্রিকার প্রথম বর্ষে ১৯০২ সালে প্রকাশ পায়। গল্পে যে ভৌতিক চরিত্রটি আছে তাকে ভূত বললে হয়ত বেশী বলা হবে, তা মানুষেরই আত্মা। তাই ভূত জনিত ধারণা যা আমাদের মধ্যে আছে তার থেকে তা আলাদা। সাধারণ মানুষের মতোই তাকে দেখতে । মৃত্যুর খবর না পাওয়া পর্যন্ত কারোর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় যে স্ত্রী লোকটি আসলে মানুষ নয় আত্মা। বঙ্কিমচন্দ্র তাকে জমিদারবাড়ির একজন সম্মানীয়া স্ত্রীলোক অনুমান। দু'জন ব্যক্তির মধ্যে যেমন কথোপকথন হয় ঠিক সেইভাবেই বঙ্কিমবাবু ও স্ত্রীলোকটির মধ্যে কথাবার্তা হয়।

স্ত্রীলোকটি জমিদারবাড়ির মধ্যম পুত্রের স্ত্রী স্বর্গীয়া বিরহ। কিন্তু হঠাৎ এমন কিছু ঘটে যা বঙ্কিমবাবুর মনে ভীতি সঞ্চার করে। স্ত্রী লোকটি সাধারনভাবে দরজা থেকে বাড়ির বাইরে না গিয়ে জানালার পথে অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপরে বঙ্কিমচন্দ্র তাকে আর খুঁজে পাওয়া পাননি। কোনও জীবিত মানুষ এইভাবে জানালা দিয়ে নীচে লাফিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না; তিনি যে স্ত্রীলোককে খুঁজতে গিয়েছিল পরে গোমস্তার কাছে জানতে পারেন যে এই স্ত্রী লোকটি আগেই জলে ডুবে মারা গেছে। আসলে মৃত্যুর পরও সে নিজের বাড়ির মায়া ত্যাগ করতে পারেনি; বিশেষ তার স্বামী ও তার যে নিজস্ব ঘরটি ছিল তা আজও তাকে এই পার্থিব জগতের মায়াতে আটকে রেখেছে, বঙ্কিমবাবু সে ঘরটিতেই ছিলেন। অশরীরী আত্মা সে পার্থিব পৃথিবীর সঙ্গে তার সব সম্পর্ক ছিন্ন কিন্তু সে পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত প্রিয় মানুষ গুলির মায়া কাটাতে পারেনি। আত্মা হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের কোন ক্ষতি সে করেনি।

গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী 'দর্বেশিনী' গল্পে ভূতের ভয়ঙ্কর রূপের সঙ্গে পাঠকের পরিচয়। এটি ১৯০৪ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত। এই গল্পটিতে ভূত চরিত্র আনার পূর্বেই একটা ভৌতিক পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পাঠকের মনে আগে থেকেই ভয়ের সঞ্চার হয় যা ভূতের গল্পের অনুকূল পরিবেশ-

> "যেদিন গাছ কাটা হয়, সেদিন একজন ধনবান বণিক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, গাছ কাটাইয়া আপনি ভাল করেন নাই এই অতি প্রাচীন কাল হইতে এক বলবান ব্রহ্মদৈত্য বাস করিত।"[৬]

উদ্ধৃতি থেকে অনুমান করা যায় যে ম্যাজিস্ট্রেটের ভাড়া বাংলোটি ভূতের কত বড় বাসস্থান। ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোটিতে যে আগে বড় বড় ভূতের আস্তানা ছিল লেখক জানিয়ে দিতে ভোলেননি। বাংলোটির পাশে হিন্দুদের শব দাহ করা হত আগের ম্যাজিস্ট্রেট টো সাহেবের অনুমতিতে বন্ধ করা হলে এখানে ভূতের উপদ্রব বাড়ে-এটিই জনরব। লেখক এমন একটি ভূতকে তাঁর গল্পে আনলেন সে একজন ইরানী মহিলা সন্ন্যাসী দর্বেশিনী; সে গল্পের মূল চরিত্র। নিরপরাধ হওয়া সত্বেও ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারের কারণে চুরির অপরাধে তার জেল হয়। এই শাস্তি হওয়ার লজ্জায় সে দেহ ত্যাগ করে। তারপর শুরু হয় তার ভৌতিক নানারকম কার্যাবলী। সে ভূত হয়ে এসেছে তার প্রতি হওয়া অবিচারের প্রতিশোধ নিতে। একে একে ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোর সকল পাহারাদার এবং কর্মচারীকে নিজের বিকট মূর্তি দেখায়, যেখানে দেখা যায় ভূতের মুণ্ড ভূতের একটি হাতে আর একটি হাতে মশাল। কস্টেবল মূলচাঁদ সিং -এর বক্তব্যে জানা যায়-

> "পরশু রাত্রে আমি একটা স্ত্রীলোককে বাংলোর ফটক দিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম, তাহার হাতে মশাল ছিল; ওই মশাল অতি ক্ষীণভাবে জ্বলিতেছিল, ওই ক্ষীণালোকে স্ত্রীলোকের চেহারা স্পষ্ট দেখিতে পাই নাই, স্মরণ হইতেছে মাগীর মাথায় একটা খুপড় অর্থাৎ মৃত মনুষ্যের মস্তকের খুলি ছিল।"[৭]

এই ভৌতিক দৃশ্য দেখে তারা ভীত হয়েছে। হরিদ্বার পর্যন্ত ভূত ম্যাজিস্ট্রেটের পিছু নেয়। কিন্তু কারোর ক্ষতি করেনি। ভৌতিক কার্যাবলীর মধ্যে শুধু ভয় দেখানোর কাজটাই দর্বেশিনী করেছেন। গয়ায় পিণ্ডদানের মাধ্যমে দর্বেশিনীর আত্মা মুক্তি লাভ করে। এরপর তাকে আর দেখা যায়নি। কিন্তু গল্পে কোথাও স্পষ্টভাবে বলা নেই যে এই ভূতটি দর্বেশিনীর ভূত। ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রীর বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায় স্ত্রীলোকটির পোশাক দর্বেশিনীর মতো। একথা বলতে হয় যে দর্বেশিনী কেবল ভয়ই দেখিয়েছে, কারোর ক্ষতি করেনি ; এর কারণ হয়ত হতে পারে যে মনুষ্য থাকাকালীন দর্বেশিনী খুবই ধার্মিক মানুষ ছিলেন। মৃত্যুর পরও তা খানিকটা রয়ে গেছে তার মধ্যে যার কারণে সে কারোর ক্ষতি করার কথা ভাবেনি।

'জোলা আর সাত ভূত' গল্পটি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর রচনা। বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যের অন্যতম রূপকার হলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। এটিও একটি ভূতের গল্প হলেও পূর্বে আলোচিত গল্প গুলির মতো ভয়ঙ্করতা এখানে নেই। বরং ভূতেরাও যে ভয় পায় তার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত এবং এই ভয়ের কারণ যে মানুষ তা জানার পর আরও বিস্ময় জাগে। ভূত, পেত্নী, রাক্ষস ইত্যাদি এদেরকে নিয়ে আমাদের মন গড়া একটি ভয় রয়েছে। যা যুগান্তরব্যাপী এমনকি সাম্প্রতিক সময়ে দাঁড়িয়েও তা প্রাসঙ্গিক। লেখক আসলে ভূতের মাধ্যমে শিশুদের নীতিশিক্ষা দিতে চেয়েছেন। এবং ভূত সম্পর্কিত ভয়কে অনেকাংশে লঘু করতে পেরেছেন।

গল্পটিতে সাতটি ভূত বর্তমান। যারা জোলা নামক এক বালকের কথায় ভীষণ ভীত। একজন সামান্য বালক যাকে কিনা ভূতেরা ভয় পাচ্ছে। উপরন্তু বালকের হাত থেকে

বাঁচার জন্য নানা উপহারে তুষ্ট করেছে তাকে,-

"ঐ দেখ, কোত্থেকে এক বিটকেল ব্যাটা এসেছে, আর বলেছে আমাদের সাতজনকেই চিবিয়ে খাবে, এখন কি করি বলত!"[৮]

জোলা তার মায়ের হাতে তৈরী সাতটি পিঠে নিয়ে বটগাছ তলায় বসে বলতে থাকে-

"একাটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব।"[৯]

এটি শুনে সাতটি ভূত ভাবে জোলা তাদেরকে খাবে বোধ হয় তাই নানা উপহার যেমন- হাড়ি, মুখ থেকে মোহর পড়া ছাগল, লাঠি দিয়ে খুশি করতে চেয়েছে।

এই গল্পে ভূতকে ভয় পাওয়ার রীতি যেন বদলে গেছে এবং এই ভয় উল্টোপথে যাত্রা করছে। ভূতদের কাজকর্ম নিঃসন্দেহে বোকা এবং নির্বোধ তা নাহলে তাদের আচরণ এমন হওয়ার কথা নয়। উপেন্দ্রকিশোরের গল্পে মূল বৈশিষ্ট্য হল নীতি শিক্ষা তা এই গল্পে বহাল রয়েছে। ভূতেদের থেকে পাওয়া জিনিসগুলি চুরি করার অপরাধে জোলার বন্ধুর উচিত শাস্তি তা প্রমাণ করে দেয়,-

"লাঠি তাকে পিটে পিটে মাথা থেকে পা অবধি চামড়া তুলে ফেলল।"[১০]

এই গল্পের মাধ্যমে লেখক ভালো কাজকর্ম ও মন্দ কর্মের কী কী পরিণতি হতে পারে তা বোঝাতে চেয়েছেন তার গল্পের পাঠককে।

প্রমথ চৌধুরীর 'আহুতি' গল্পটির সম্পর্কে বলবার পূর্বে একথা খুবই প্রয়োজনীয় এখানে ভূতেদের উপস্থিতির আভাস রয়েছে। কিন্তু আক্ষরিকভাবে তাদের প্রত্যক্ষ করা যায় না। একটা ভৌতিক পরিবেশ বা বলা যেতে পারে একপ্রকার গা ছমছমে অনুভূতি সারা গল্প জুড়ে

বিদ্যমান। গল্পটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠক অপেক্ষা করতে থাকে যে হয়ত ভূতের আগমন হবে এনং এই অপেক্ষায় পাঠককে গল্পটি সম্পূর্ণ না করা পর্যন্ত পড়তে বাধ্য করে। এই গল্পের একটি দৃশ্য থেকে তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল-

> "সর্দারজী উত্তর করিলেন,হুজুর, এদের টেনে না তুললে এরা উঠবে না। সুমুখে ভয় আছে তাই এরা গাঁজায় দম দিয়ে মনে সাহস করে নিচ্ছে আমি বল্লুম, কি ভয়? সে জবাব দিলে, হুজুর, সে ভয়ের নাম করতে নেই, একটু পরে সব চোখেই দেখতে পাবেন।"[১১]

উদ্ধৃত বাক্যটিকে একটু ভালো করে নজর দিলে গল্পের রহস্যজনিত অনুভূতি বা বলা যেতে পারে ভৌতিক অনুভূতি পাঠককে অভিভূত করে। যে ভয়ের কথা সর্দারজী বলছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় গল্প একটু এগোলেই-

> "এই কোলাহলের ভেতর থেকে একটা কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল সে হচ্ছে রাম নাম, ক্রমে আমার পাঁড়েজিও বেহারাদের সঙ্গে গলা মিশিয়ে 'রামনাম হ্যায়' রামনাম হ্যায় সভ হ্যায়, এই মন্ত্র অবিরাম আউরে যেতে লাগল।"[১২]

আরেকটু অগ্রসর হলেই গল্প কথকের মনে হয় যেন একেবারে মৃত্যুর রাজ্যে প্রবেশ করেছেন-

> "আর সে ইট এত লাল যে , দেখতে মনে টাটকা রক্ত যেন চাপ বেঁধে গেছে। এই ভূতলশায়ী জনপদের ভিতর থেকে যা আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে, সে হচ্ছে গাছ। তার একটিতেও পাতা নেই, সব নেড়া সব শুকনো, সব মরা।"[১৩]

ত্রৈলোক্যনাথের রচনার পূর্বে ও তাঁর সাময়িককালে লেখা এই সমস্ত গল্পে ভূত বর্তমান রয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত সাহিত্যকদের লেখায় যে ভূত পাওয়া যায় তারা অশরীরী আত্মা বা প্রেত এরা শুধু মাত্র ভয় দেখাচ্ছেন বেঁচে থাকা মানুষদের আর কোনও বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে দেখা যায় না।

তথ্যপঞ্জি

১) সুকুমার সেন ও সুভদ্রকুমার সেন(সম্পা), *উপছায়া,* কলকাতা: সিগনেট প্রেস, মে ২০১৭, পৃ. ৭ ।

২) আব্দুল কাফি ও ঋকসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *ছায়াশরীর সেকাল একালের ভূতের গল্প,* কলকাতা: তৃতীয় পরিসর, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৯।

৩) সুকুমার সেন সুভদ্রকুমার সেন(সম্পা), *উপছায়া,* কলকাতা: সিগনেট প্রেস, মে ২০১৭, পৃ. ২ ।

৪) তদেব, পৃ. ৩ ।

৫) তদেব, পৃ. ৫ ।

৬) তদেব, পৃ. ৪০ ।

৭)তদেব, পৃ. ৪৫ ।

৮)উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, *উপেন্দ্রকিশোর রচনাবলী,* পূর্ণাঙ্গ অখণ্ড সংস্করণ, কলকাতা: সাহিত্যম্, ২০০২, পৃ. ১৩৮ ।

৯) তদেব, পৃ. ১৩৮ ।

১০) তদেব, পৃ. ১৪০ ।

১১) সুকুমার সেন ও সুভদ্রকুমার সেন (সম্পা), *উপছায়া,* কলকাতা: সিগনেট প্রেস, মে ২০১৭, পৃ. ১৩৬ ।

১২) তদেব, পৃ. ১৩৭ ।

১৩) তদেব, পৃ. ১৩৭ ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে ভৌতিক আবহ ও ভূতেদের দ্বারা উনিশ শতকের সমাজ বর্ণনা

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯) সমগ্র বাংলা সাহিত্যে রঙ্গ-ব্যঙ্গ মূলক রচনার শিল্পী হিসেবে পরিচিত। ত্রৈলোক্যনাথের রচনার সময়কাল ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি তাঁর কথাসাহিত্যের বিষয় সংগ্রহ করেছিলেন ঊনবিংশ শতকের যুগ পরিবেশ থেকে। যে সমকালে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর রচনার সৃষ্টি করেছেন সেই সমাজ জীবনের আচার-বিচার, রীতি-নীতিগুলি হয়ত আজ বর্তমানে নেই, কিন্তু এখনও পাঠক মহলে তাঁর গ্রন্থগুলি যথেষ্ট সমাদরের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য। ভূত-প্রেত, অলৌকিক জীবজন্তু ত্রৈলোক্যনাথের কয়েকটি লেখা ছাড়া প্রায় রচনাতেই স্থান পেয়েছে। তিনি এমন এক ধরনের বিষয় সাহিত্যে নিয়ে এলেন যা শিশুপোষক উপাদান। তাঁর গল্প বলার রীতি আধুনিক ছোটগল্পের রীতি নয়। অতি প্রাচীন কথ্য বা মৌখিক রীতিই তিনি গ্রহন করেছিলেন দেশজ ঐতিহ্যের অনুসরণে। তাঁর গল্পের মূল রীতি কথকতার। এই সময়ে দাঁড়িয়ে ত্রৈলোক্যনাথ প্রাচীন বাংলার লোককথা ও রূপকথার উপাদান গুলিকে সাহিত্যে এনেছেন। যা নিজস্বতায় ও স্বদেশীয়ানায় পরিপূর্ণ। আর এখানেই লেখক ত্রৈলোক্যনাথের অভিনবত্ব।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতার অধিকারি। শিক্ষকতা, আরক্ষধিনায়কতা, সার উইলিয়াম হান্টারের সহকারিতা, উত্তর-পশ্চিম ভারতে সরকারি কর্মোপলক্ষে দুর্ভিক্ষ-

কবলিত মানুষের কল্যাণসাধন ও দুর্দশাপীড়িত অবহেলিত কারুশিল্পীদের পুনর্বাসন, কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব ও কৃষি বিভাগে কর্ম, বিলাত-ভ্রমন, কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে যোগদান, শেষে ১৮৯৬–তে এই পদ থেকে অবসর গ্রহণ। কর্ম জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সাহিত্য কর্মের সূচনা: ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে 'কঙ্কাবতী' প্রকাশ ও সাহিত্যখ্যাতি লাভ। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরের সহকারী কিউরেটর থাকাকালীন বাঙ্গালোরে ' Change and Progress' সম্পর্কে ভাষণ দান। এই ভাষণ দেশহিতৈষী ত্রৈলোক্যনাথের পরিচায়ক। এ ভাষণটি প্রথমে বাঙ্গালোরের দৈনিক পত্রে, পরে পুস্তিকারূপে পুনঃমুদ্রিত হয়। পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই জীবনের অগ্রগতি। একে যে অস্বীকার করে সে মূঢ়, সে মৃত্যুকে ডেকে আনে অতীত গৌরবচর্চায় লাভ নেই জ্ঞানের কোনো একচেটিয়া অধিকার নেই, আধুনিক পৃথিবীতে অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানেই জাতির মুক্তি ও কল্যাণ। সংস্কারমুক্তির জন্য চাই বিজ্ঞানচর্চা। ভারতে প্রায় সব স্থানে কাপুরুষতা, অজ্ঞাতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতা বিদ্যমান। এর থেক মুক্তি চাই। বর্ণবৈষম্য দূর করা চাই- যে বর্ণবৈষম্য অস্পৃশ্যতা, ভাষা ও জাতগত ভিন্নিতার পোষক, তাকে উৎপাটন করা চায়। সে কারণে প্রয়োজন লোকশিক্ষা। শিক্ষায় মুক্তি, শিক্ষায় কল্যাণ। তিনি বাঙ্গালোরের সমাবেশে 'Change and Progress' এ বলেছেন- 'Firstof all we must strive to have compulsory education on this country, cost what it may. Let my people go without clothing, but let them not go without education.'('Change and Progress': Bangalore Speech, 1888) ত্রৈলোক্যনাথেরসাধারণ মানুষের জন্য এই কল্যাণ কামনার প্রতিক্রিয়া তাঁর গল্পের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ত্রৈলোক্যনাথের গল্প সংকলন চারটি। 'ভূত ও মানুষ' (১৩ জানুয়ারি ১৮৯৬),

'মুক্তামালা'(১৯০১), 'মজার গল্প'(১৯০৬), তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত একটি গল্প 'ডমরুচরিত'(১৯২৩)। এছাড়াও তিনি কয়েকটি উপন্যাস লিখেছিলেন। সেগুলি হল- 'কঙ্কাবতী'(১৮৯২), ফোক্‌লা দিগম্বর'(১৯০১), 'ময়না কোথায়' (১৯০৪), 'পাপের পরিণাম'(১৯০৮)। 'কঙ্কাবতী' উপন্যাস পাঠ করলে তাঁর সাহিত্য কীর্তি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা যায়। গত শতকের দশক থেকে শুরু করে প্রথম বিশ্বসমর পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে। চারটি সংকলনের মোট গল্প সংখ্যা তিরিশ। বঙ্কিম যুগের অবসান কালে ও রবীন্দ্র যুগের সূচনা কালে ত্রৈলোক্যনাথ গল্প রচনা করেন। ছোটো গল্প বঙ্কিমচন্দ্র লেখেননি, রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের সূচনা ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে। 'হিতবাদী', 'সাধনা', 'ভারতী' ,'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে' গল্পগুচ্ছের প্রথম দু'খণ্ডের গল্পসমূহ প্রকাশিত হয়। এসময়ে ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর গল্প লেখেন। দুজনের গল্প পাশাপাশি রেখে আমরা এই অনায়াসে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে রবীন্দ্র-গল্প ভাবনা ও শিল্প-রূপ ত্রৈলোক্যনাথকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করেনি। আসলে শিল্প ভাবনায় দুজনে ভিন্ন জগতের অধিবাসী ছিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথে চারটি গল্প সংকলনই গল্প-মালা। গল্পের মধ্যে গল্প, অথবা এক গল্পের টানে অপরাপর গল্প। ত্রৈলোক্যনাথ গল্পরচনায় কোনো আধুনিক আদর্শ অনুসরণ করেননি। জাতকের গল্প বা পঞ্চতন্ত্রের গল্প, 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বা 'বত্রিশ সিংহাসন'-এর গল্প, 'হিতোপদেশ', একসহস্রাধিক রজনীর গল্প, চসারের ক্যান্টারবারি টেল বা বোকাচিওর ডেকামেরন বা ঈশপের গল্প যে ধরনের গল্প মালা, তারই অনুসৃতি ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে দেখা যায়। উদ্ভট, আজগুবি, অলৌকিক ও রূপকথা উপাদানে পরিপূর্ণ তাঁর গল্প। অথচ তা একেবারে বাস্তব বর্জিত নয়। ত্রৈলোক্যনাথের মানবতাবাদের-যুক্তিধর্মীতা, পরার্থপরতা, দেশহিতৈষিতা ও

মানবমুখিতার পরিচয় তাঁর গল্পে ছড়ানো আছে। সমাজ সংস্কারের সচেতনতা ও মানব প্রেমিকের সীমাহীন দরদ তাঁর গল্পে উপস্থিত।

আখ্যান বা ফেবল বা টেল এর ধর্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল- কথনধর্মীতা, একটি প্রধান গল্প বা চরিত্রের সূত্রে গ্রথিত পরম্পরিত গল্পমালার শৃঙ্খল, শিশুরা যে সমস্ত উপাদান বেশি গ্রহণে আগ্রহী তা গল্পে ব্যবহার করেছেন তিনি (যেমন- আজগুবি, উদ্ভটে মিশ্রিত অলৌকিক রূপকথা এবং ভূত- প্রেতের উপস্থিতি)। গল্পের মধ্যে গল্প বলেছেন তিনি।

আধুনিক বাংলা গল্প বা উপন্যাস সাহিত্যে ভূতপ্রেত ও অলৌকিক বিষয় নবসংযোজক উপাদান।এই সমস্ত বিষয় পাঠক সমাজকে খুব সহজেই আকর্ষণ করে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের সময় কালকে সাহিত্য রচনার ধারায় যদি ভাগ করা যায় তাহলে বহু রচনার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। উনিশ শতকের প্রথমদিকে গদ্য, আখ্যানধর্মী, প্রহসন, নাটক, কাব্য, রোমান্সধর্মী নভেল বা উপন্যাস প্রভৃতি লেখা পাওয়া যায়। উনিশ শতকের শেষ ভাগটি পুরোপুরি বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ ও রবীন্দ্রনাথের যুগের প্রথম পর্যায়। সেখান থেকে বাংলা সাহিত্যে সার্থক উপন্যাসের (দুর্গেশনন্দিনী) পথ চলা। আর এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)- এর হাতে সৃষ্টি হল সার্থক ছোটগল্প। এই সময়কাল পর্বে যাঁরা লিখছেন সকলেই প্রায় বঙ্কিম অনুসারী রচনাকার। ত্রৈলোক্যনাথ ইউরোপীয় ধাঁচের নভেল লেখার পথে অগ্রসর হননি। রবীন্দ্রনাথ যে সময় কালপর্বে ছোটগল্পের রূপানুসন্ধানে রত, সেই একই সময়ে ত্রৈলোক্যনাথ গল্প বলার প্রাচীন রীতির অনুস্মরণকারী। ভূত-প্রেত, অলৌকিক ও কাল্পনিক জীবজন্তুর মিশেলে

এমন একটা জগত নির্মাণ করেছিলেন তিনি যার অভিনবত্ব বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝামাঝি একটা অবস্থায় পাঠককে বন্দী করে রাখে। আর এই সময়কাল পর্বেই সম্ভবত প্রথম ভূতের গল্পের চল শুরু করলেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯)। ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর কথাসাহিত্যের বিষয় সংগ্রহ করেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগপ্রতিবেশ থেকে। সেই সমাজজীবন সেই রীতিনীতি কোনো কিছুরই বর্তমানে অস্তিত্ব নেই কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থগুলি এখনও পাঠক মহলে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য। তিনি বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ-সাহিত্যিক বা satirist. এর পূর্বে মাইকেল মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের লেখায় ও বেশ কিছু সাহিত্যকের রচনায় কিছু না কিছু ব্যঙ্গধর্মী রচনা লক্ষ্য করা যায়। ত্রৈলোক্যনাথের সমাজকে কাছে থেকে দেখে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলে নিজের ও পারিপার্শ্বিক অপরের দুঃখ-দুর্দশার ঘটনা তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে। তিনি গল্প বলার সহজাত প্রবৃত্তি নিয়েই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। সাহিত্যের ভূমিতে এই প্রতিভা খুব বিরল।গল্প অনেকেই লেখেন কিন্তু গল্প বলবার এই ভঙ্গী সাহিত্যে একটা আলাদা মাত্রা দান করে। মুদ্রিত সাহিত্য আসার আগে গল্প বলার ভঙ্গী মানব সমাজে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখন তা লুপ্তপ্রায়। তাঁর রচনা পড়লে দেখা যাবে তিনি যেন গল্প বলছেন।

ত্রৈলোক্যনাথের প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘ভূত ও মানুষ’ প্রকাশিত হয় ১৩০৪ বঙ্গাব্দে(১৩ই জানুয়ারি, ১৮৯৬)। তাঁর অধিকাংশ রচনা সাপ্তাহিক ‘বঙ্গবাসী’ ও বঙ্গবাসী কর্তৃপক্ষ পরিচালিত ‘জন্মভূমি’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ‘ভূত ও মানুষ’ গ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প ‘বীরবালা’র প্রথম প্রকাশ ১২৯৯ বঙ্গাব্দে, ‘জন্মভুমি’র পৌষ সংখ্যায়। গল্পটি রূপকথার ধাঁচে লেখা। গল্পটি শুরু হওয়ার আগেই লেখক কাহিনির শুরুতে বলেছেন- ‘পাঠক, গল্পটি বুঝিয়া পড়িবেন’। ‘কঙ্কাবতী’

উপন্যাসের মতো এই গল্পে ত্রৈলোক্যনাথ একটা স্বপ্ন জগতের অবতারনা করেছেন। বীরহনুমান দেবীসিংহের টিকি ধরে টানাটানি করায় তাঁর ঘাড়টি খুট্ করে উঠেছে। আর তিনি জ্ঞান হারিয়েছেন। জ্ঞান হলে দেখেছেন তিনি ভারতসিংহের পুত্র ধর্মদত্ত। স্বপ্নে নিজেকে ধর্মদত্ত মনে করেছিলেন। আবার ধর্মদত্ত রূপেই অপ্সরাদের মাঝখানে বীরবালার অলৌকিক রূপ দেখে আকাশের দিকে মাথা তুলতে আবার তার ঘাড়টি খুট্ করে উঠেছে। অমনি ধর্মদত্ত আবার নিজেকে দেবীসিংহ রূপে দেখতে পেয়েছেন। স্বপ্নে নিজেকে ধর্মদত্ত ভাবা এবং অদ্ভুত সব ঘটনা দেখা এই ক্ষনিক সময়ের মধ্যে এত ঘটনার উপস্থিতি যা আশ্চর্য ব্যপার।

বীরবালা রূপকথার গল্পের মত এক আশ্চর্য জগতে পৌঁছেছে। গল্পটির শুরুতেই লেখক জানিয়ে দিয়েছেন যে গল্পটি এদেশের নয়। লেখক তাঁর কল্পনা শক্তির সাহায্যে বীরবালাকে নিয়ে গেছেন সুদূর বোগদাদে ও বিলেতে। আকাশ পথে যাত্রা পথে তার দেখা হয়েছে অনেক ভূতের সঙ্গে। পৃথিবীর প্রান্তে থাকা সবুজ ভূতেরা তার ক্ষতি করতে চেয়েছে ও এক সাহেব ভূত তার উপকার করেছে। ত্রৈলোক্যনাথ যখনি তাঁর রচনায় ভূত প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন তখনি তা ছবি আকারে মেলে ধরেন তিনি।

> ‘...বীরবালা দেখিলেন যে অতি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা আমাদের এই পৃথিবীটি চারিদিকে বেষ্টিত। ...প্রাচীরের ওধারে কি আছে? সেটি দেখিতে হইবে। প্রাচীরের গায়ে গোল গোল ছোট ছোট ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। সেই ছিদ্র দিয়া বীরবালা উঁকি মারিলেন। সর্বনাশ! প্রাচীরের ও-ধারে পৃথিবীর ও-পারে কোটি কোটি খর্বাকার ভূত। প্রাচীর ধরিয়া ক্রমাগত তাহারা ঠেলিতেছে। ইচ্ছা-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করে। পৃথিবীতে আসিয়া পৃথিবী একেবারে রসাতলে দিবে, এই তাহাদের বাসনা। কোটি কোটি ভূতগণ একবার যদি প্রাচীর ভেদ করিয়া পার হইতে পারে, তাহা হইলে পৃথিবীর আর রক্ষা নাই।’’[১]

পৃথিবীর প্রান্তভাগে গিয়ে কবজ হারিয়ে বীরবালা সবুজ ভূতেদের খপ্পরে পড়েছে। এই সবুজ ভূতেরা তার মাংস দিয়ে পিঠে প্রস্তুত করে তাদের পৌষ পার্বণের উৎসব পালন করতে চায়।

> "এই পৌষপার্বণে তাঁহারা বীরবালাকে কাটিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া খাইবে, সবুজ ভূতেরা এই পরামর্শ করিতে লাগিল। চারিদিকে চাউল কুটিবার ধূম পড়িয়া গেল। ডালবাটা হইতে লাগিল।"[২]

ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর গল্পের বিষয় গ্রাম বাংলার উপাদান থেকে গ্রহন করেছিলেন। তাই তাঁর সৃষ্ট ভূতেরাও সাধারণ মানুষের মতো পৌষপার্বণ করে, চাল কুটে, ডালবাটা করে। তারাও উৎসবের আগে ঠাকুর বা দেবতেকে নিবেদন করে তারপর নিজেরা প্রসাদ গ্রহন করে। ভূতেদেরও একটা সমাজ রীতি-নীতি, আদব-কায়দা রয়েছে। ভূতেদের উৎসবের পুরো প্রক্রিয়াটিই আমাদের চেনা সমাজের চিত্র। সবুজ ভূতেদের একটি ছেলের পিঠে করে বীরবালা পৌঁছায় মহাসমুদ্রে। ভূমধ্যসাগরের তীরে সেখানে তার দেখা হয় একটি সাহেব ভূতের সঙ্গে। বীরবালার নিঃশ্বাসে সাহেব ভূতের সব হাড় যোড় খুলে যায় । পরে কাদা দিয়ে তার শরীর জোড়া দেয় ও তাকে সুস্থ করে তোলে বীরবালা। এই সাহেব ভূত বালি দিয়ে টেলিগ্রাফের তার তৈরি করে বীরবালাকে বিলেতে যেতে সাহায্য করে। একি গল্পে খারাপ ভূত ও পাশাপাশি ভাল ভূত রয়েছে।

'বীরবালা' গল্পের শিরোনামে লেখক সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন,- 'পাঠক গল্পটি বুঝিয়া পড়িবেন।' গল্পটি যে অসাধারণ, প্রারম্ভিক ছত্র ক'টিতেও লেখক এই ইঙ্গিত করেছেন,- "গল্পটি এদেশের নয়,-পশ্চিমের, বাঙালির নয়,-হিন্দুস্তানীর। ব্রাহ্মণ কায়েতের নয়,- রাজপুতের।" অতএব, সমঝদার পাঠক যাঁরা,- নিছক গল্পের জন্যেই গল্প পড়তে যাঁরা নারাজ,- তাঁরা এই আদি-অন্তহীন আজগুবি গল্পের গভীরে যা-নয় তাই তত্ত্বের সন্ধান করতে গিয়ে খালি

হাতে ফিরে আসবেন। আসলে গল্প-বলিয়ের এ-ও এক মজা। আগে থেকেই শ্রোতার মনে অভিনব রসের প্রত্যাশা জাগিয়ে সহজ সুরে সরল গল্প শেষ করে ফেলার এক নূতন মজা খেলেছেন এখানে ত্রৈলোক্যনাথ। ভালো গল্প বলিয়ের প্রধান বৈশিষ্ট গল্পের আগাগোড়া শ্রোতার উৎকণ্ঠা টুকুকে অটুট রেখে যাওয়ার দক্ষতা; ত্রৈলোক্যনাথ এখানে তাই করেছেন। তবুও সচেতন শ্রোতার দৃষ্টির ফাঁকে জীবনের দুটি-একটি পরিচিত রূপকে স্মিতহাস্যের মধ্য দিয়ে তিনি সহজে প্রতিফলিত করে গেছেন; তাতে শ্রোতার মনে কল্পনা জাগে না কৌতুক রস উপভোগ করে পাঠকের মন সন্তুষ্ট হয়। আলোচ্য গল্পে ধর্মদত্তকে 'চিমটা দ্বারা সবলে প্রহার' করে অমবস্যা বাবাজী বলেছিলেন,-

> "ধর্মদত্ত! দিন দিন তুই অতি মূর্খ ও অতি নির্বোধ হইতেছিস। শাস্ত্রে আছে, 'চাচা আপনা বাঁচা'। তাই প্রতিবাসীর গৃহে ডাক পড়িলে সেকালের লোকে আপনার আপনার ঘরে দোহারা তেহারা খিল ও হুড়কো দিয়া বসিয়া থাকিত, কেহ বাহির হইত না। আজকালের ছেলেরা সব হইল কি? পরের জন্য প্রাণ সমর্পণ!"[৩]

শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ এখানে তাঁর শ্রোতাদের মনের কণেও আঘাত করতে চেয়েছেন; অমবস্যা বাবাজীর চিমটার মতো তা মারাত্মক নয়,- এ আঘাত কৌতুকের মৃদু আঘাত ; মনের তলায় একটু সুড়সুড়ি, বড় জোর আদর-করা চিমটির আঘাত। আর এই আঘাত রচনা করেছেন ত্রৈলোক্যনাথের শিল্পী ব্যক্তিত্ব । বাঙালি, তথা ভারতবাসীর যুগ-যুগব্যাপী স্বার্থান্ধতার প্রতি তিনি মৃদু আঘাত করেছেন। গল্প শেষে ত্রৈলোক্যনাথ বলেছেন,-

> "এই বীরবালার গল্পটি যাঁহারা মনোযোগ দিয়া পাঠ করেন, চিরদিন তাঁহাদের ঘরে পৌষ পার্বণের আনন্দ বিরাজ করে, তাঁহাদের গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হয়।"[৪]

এর চেয়ে শ্রেষ্ট আর কোনো ফলশ্রুতি গল্পে নেই । তাহলেও, কেবল 'বীরবালা'তেই নয়, ত্রৈলোক্যনাথের অন্যান্য গল্পেও তাঁর সহজ জীবনবোধ আজগুবি কাহিনির আস্টে পৃষ্টে জড়িয়ে গিয়ে মজার গল্পের এক নূতন জগত সৃষ্টি করেছে। 'বিরবালা'তে সেই জাতি- স্বভাব অস্বচ্ছ ; তাই ত্রৈলোক্যনাথের গল্প সাহিত্যের মধ্যে তা অপক্ষাকৃত দুর্বল। এই নূতন জাতের গল্পের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। কেবল গাল্পিকের সিদ্ধির পরিচায়ন প্রসঙ্গেই। ত্রৈলোক্যনাথ উদ্দেশ্য প্রনোদিত শিল্পী নন; চিরাচরিত মজার গল্পে পোঁটলায় পুরে নিজের চোখে দেখা জীবনের একটি প্রাণময় স্বাদ তাঁর সকল রচনার মধ্যে বিস্তার করে দিয়েছেন। জীবনের সেই ঝাঁঝহীন আঘ্রাণেই ত্রৈলোক্যনাথের মজার গল্পের স্বাতন্ত্র্য।

'ভূত ও মানুষ' গ্রন্থের তৃতীয় গল্প 'লুল্লু'।প্রথম প্রকাশ ১২৯৮ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা 'জন্মভূমি' পত্রিকায়। 'লুল্লু' গল্পটিতে ভূতের প্রাধান্য রয়েছে। এই গল্পটিতে ভূত গুলিকে তিনি রূপক আকারে ব্যবহার করেছেন। তাই সমগ্র বাংলা সাহিত্যে 'লুল্লু' গল্পটিকে ব্যঙ্গধর্মী রচনা বলা যেতে পারে।

সেখ আমির তার স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য কৌতুক করার জন্য মজার ছলে বলেছিলেন, 'লে লুল্লু'। এই একটি কথাকে কেন্দ্র করেই ঘটেছে কাহিনির পথ চলা। আমির অজান্তে এই কথা বলেছিল। কিন্তু তার জানা ছিল না যে লুল্লু একটি ভূতের নাম । তার বাড়ির ছাদেই সেই ভূতটি বসে ছিল। আমির বুঝে উঠতেই পারিনি সত্যি সত্যি ভূত এসে তার স্ত্রীকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে । স্ত্রীর অনুসন্ধানে পথে বেড়িয়ে আমিরের ভূত ও মানুষ সমাজের বহুজনের সঙ্গেই দেখা হয়েছে। কাহিনির মাঝে মাঝেই এমন সব ঘটনার অবতারণা করেছেন যেখানে তিনি সরাসরি

ব্যঙ্গের মাধ্যমে সমাজের মানুষ ও তাদের নির্মিত পরিকাঠামকে কটাক্ষ করেছেন। পাশাপাশি এই গল্পে গ্রামীণ বাংলার কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশ দেখিয়েছেন যা অন্ধবিশ্বাসের মোড়কে ঢাকা। আবার তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণকারী বাবুদের ব্যঙ্গবিদ্রুপ করেছেন। কখনো কটাক্ষের মূল বিষয় ঊনবিংশ শতকের সংবাদপত্রগুলি।

ইউরোপীয় বা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে মানুষ যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সব কিছুর বিচার করতে শেখে। সেখানে প্রচলিত কুসংস্কার, যা যুক্তির বাইরে তাদের কাছে তার স্থান নেই। কাজেই এই সমস্ত ভূত যারা অন্ধবিশ্বাসের রূপক তারা অসন্তুষ্ট পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণা ও শিক্ষার প্রতি। যে সমাজের কিছু অংশ মানুষ যারা নবজাগরণের নতুন আলোর পথে পা মেলাতে চায় না সেই সব মানুষের ভাবমূর্তি গুলি ভূত ও ডাইনি কণ্ঠে প্রকাশ পেয়েছে।

> "... ইংরেজদের প্রভাবে আমাদের সকল ব্যবসায় একরূপ লোপ পাইয়াছে। অন্য ব্যবসার কথা দূরে থাকুক, ভূতদিগের ভূতে পাওয়া ব্যবসাটি পর্যন্ত লোপ হইয়া গিয়াছে। এই হতভাগা দেশের লোকগুলো এমনই ইংরেজি ভাবাপন্ন হইয়াছে যে, কাহাকে ভূতে পাইলে কি ডাইনে খাইলে, বলে কিনা হিষ্টিরিয়া হইয়াছে। এ কথায় রক্তমাংসের শরীরে রাগ হইবেই। তাই ঘৃনায় ভূতকুল একবাক্য হইয়া বলিল,- 'দূর হউক, আর কাহাকেও পাইব না। ডাইনীকুল একবাক্য হইয়া বলিল,- 'দূর হউক, আর কাহাকেও খাইব না।' ভারতে ভূতকুল ও ডাইনীকুল আজ তাই মৌনী ও ম্রিয়মান।"[৫]

এই গল্পে ভূত চরিত্র গুলির মাধ্যমে ত্রৈলোক্যনাথ আসলে দেখাতে চেয়েছেন তখনকার দিনের সমাজ ব্যবস্থাকে। ভূত ও মানুষ তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি গল্পে পাশাপাশি অবস্থিত। অনেক সময় এই ভূত গুলিকে মানুষেরই প্রতীকী হিসেবে ব্যবহার করেছেন তিনি যারা সেই সমাজের

প্রতিনিধিত্ব করছে। গল্পটিতে ভূত সমাজেরও একজন ঘ্যাঁঘ্যোঁ ভূত আছে, যে কিনা ভূতেদের গেজেট অফিসার। তার কাছে ভূত সমাজের সমস্ত খবর পাওয়া যায়।

এই কাহিনিতে লেখক লুল্লু, ঘ্যাঁঘ্যোঁ , গোঁগোঁ এই তিন ধরনের ভূতের আগমন ঘটিয়ে দেখিয়েছেন সমাজের বিভিন্ন রূপ। লুল্লু ভূত যেন নব্য বাবু সমাজের প্রতীকী চিত্র। সেখ আমিরের স্ত্রীকে চুরি করে নিয়ে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে বলে-

> "...দেখ, এখন আমি সাবাং মাখিতে আরম্ভ করিয়াছি। রোজ সাবাং মাখি। রং অনেক ফরসা হইয়া আসিয়াছে। আর কিছুদিন পরে লোকে আমাকে আর চিনিতে পারিবে না। যেখানে যাইব, সকলে বলিবে, 'লুল্লু নয়, এ সাহেব ভূত। কোন লর্ডের ছেলে হইবে। ... সকল ভূতেই বলে লুল্লু সব্য ভব্য নব্য ভূত ।"[৬]

এই ভাবেই লুল্লু অনেক কিছু মন ভোলানোর কথা আমিরের স্ত্রীর কাছে বলে । কিন্তু লুল্লু তার মন ভোলাতে ব্যর্থ। লুল্লু ভূতকে আমির পত্নী চণ্ডুর নেশার প্রতি আসক্ত করে তোলে।

ত্রৈলোক্যনাথের সৃষ্ট ভূত চরিত্র গুলি আসলে চিরাচরিত ভয়ানক বা গা ছমছমে গোছের ভূত নয়। ভূতের গল্প লেখা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না; বরং মানুষের মনে জমে থাকা অন্ধ কুসংস্কারকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন তিনি।

> "... মানুষের মনের ভিতর যে কত অন্ধকার আছে, তাহার সীমা নাই। কোদালদিয়া কাটিয়া কাটিয়া ঝুড়ি পুরিয়া এই অন্ধকার কলে ফেলিলেই প্রচুর পরিমানে ভূত প্রস্তুত হইতে পারে।"[৭]

অনেক সময়ই ভূত কোনও ভৌতিক সমাবেশ নিয়ে মানুষের সামনে আসছে না । লুল্লু' গল্পে দেখা যায় তাই দিনের বেলাতেই ভূত জনসমক্ষে আবির্ভূত। ভূতের সঙ্গে কোথাও যেন একটা অন্ধকারের যোগ আছে মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই কাহিনিতে গল্পকার অতি নিপুণতার সঙ্গে এমন একটি পরিবেশের উপস্থাপনা করেছেন যেখানে ভূত দিনের বেলা দু'প্রহরে ব্রাহ্মন ও আমীরের আহ্বানে দেখা দিয়েছে-

> "গাছটি দুলিতে লাগিল, ডালপালা সমুদয় মড়মড় করিতে লাগিল। তারপর গাছের ডগায়একস্থানে সহসা অন্ধকারের আবির্ভাব হইল। দিন দুই প্রহরে, চারিদিকে সূর্যের কিরণ,আর সকল স্থানেই আলো, কেবল সেই স্থানটুকুতেই অন্ধকার। ক্রমে অন্ধকার রাশি জমেগাড় হইতে গাড়তর হইতে লাগিল। অবশেষে তাহা এক ভীষণ প্রকাণ্ড নর মূর্তিতেপরিণত হইল। নরমূর্তি ধরিয়া ভূত গাছ হইতে নামিয়া আসিল, বৃক্ষের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।"[৮]

উনিশ শতকের নকশা জাতীয় লেখা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'(১৮৬৩-৬৪) রচনায় কালীপ্রসন্ন সিংহ দেখিয়েছেন গ্রামীণ ও নগর উভয় সমাজ জীবনে একশ্রেণীর মানুষ বুজরুকির মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের বোকা বানাত বা ঠকাত। ত্রৈলোক্যনাথ এমনই একধরনের বুজরুকির প্রসঙ্গ তুলে ধরছেন। কাহিনিতে একটি ভূত গরীব ব্রাহ্মণের দুঃখের কথা শুনে তাকে বলছে-

> "তা তোর ভাবনা নাই, তুই বাড়ি ফিরিয়া যা । তোদের গ্রামের মহাজনের কন্যাকে আমি গিয়া পাইব। কিছুতেই ছাড়িব না, কেবল তুই গিয়া যখন আমার কানে কানে বলবি যে, আমি সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়াছি, তখনই আমি ছাড়িয়া দিব । মহাজনের অনেক টাকাআছে, আর সেই একমাত্র কন্যা। অনেক ধনদৌলত দিয়া তোকে বিদায় করিবে তোর দুঃখঘুচিবে।"[৯]

'লুল্লু' কাহিনিতে ব্রাহ্মণ মহাজনের কন্যার ভূত তাড়িয়ে দিচ্ছে কোনও এক ভূতেরই সাহায্য নিয়ে। এই বুজরুকিতে ভূত ও মানুষ যুক্তি করে সমাজকে প্রতারণা করছে। সমাজ সচেতন লেখক ত্রৈলোক্যনাথ সেই সমাজে থাকা বুজরুককারি লোকেদের ব্যঙ্গের মাধ্যমে তিরষ্কার করছেন। উনিশ শতকে ভূত মানুষ ঠকানোর উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে সমাজের লোক ভূতের ধরনাকে বিশ্বাস করে, সেই সমাজেই থাকা আর এক শ্রেণির মানুষ ব্রাহ্মণ দারিদ্র্যের তাড়নায় ভূতকে কেন্দ্র করে রোজগারের যোগান করছে নিরুপায় হয়ে। এই সত্য কথাটি ব্রাহ্মণ প্রকাশ করেছে আমীরের কাছে। এই ভূত কে অবলম্বন করে গ্রামীণ সমাজে বুজরুকি ব্যবসার বাজার যে রমরমা চলছিল তার প্রসঙ্গ পাওয়া যায় ভূতের ক্রয় বিক্রয় প্রসঙ্গের মাধ্যমে-

> "যেমন জল জমিয়া বরফ হয়, অন্ধকার জমিয়া তেমনি ভূত হয়। জল জমাইয়া বরফকরিবার কল আছে অন্ধকার জমাইয়া ভূত করিবার কল কি সাহেবরা করিতে পারেননা ?...তাহা হইলে ভূত খুব শস্তা হয়। এক পয়সা, দুই পয়সা, বড় জোর চারি পয়সা করিয়া ভূতের সের হয়। শস্তা হইলে গরীব দুঃখী সকলেই যার যেমন ক্ষমতা ভূত কিনিতে পারে ।"[১০]

ভূত সমাজে লেখক ভূতগিরি করার কাজে ভূতেদের বেকার সমস্যার কথা বলেছেন, 'কেহ বা ভূতগিরি করিবার কর্ম পাইয়াছে, কেহ বা ভূতগিরি করিবার উমেদারি করিতেছে, আবার কেহ বা বেকার বসিয়া আছে।' এটি আসলে উনিশ শতকেরই বেকার সমস্যার কথা। ঔপনিবেশিক শক্তি বা সাম্রাজ্যের বিপক্ষে কথা বলার জন্য ত্রৈলোক্যনাথকে আশ্রয় নিতে হয়েছে এইসব অলৌকিক জীবজন্তু ও ভূতেদের। তাঁর সাহিত্যে এইসব উপাদান সংগ্রহ করে ঔপনিবেশিক শাসক ব্রিটিশদের প্রশ্ন করেছেন। বেশিরভাগ দেশীয় সংবাদপত্র ব্রিটিশ বিরোধী ছিল। গল্পে একটি অংশে ভূতের জবানীতে লেখক প্রকাশ করেছেন-

"দেশীয় সংবাদপত্র সকল তোমাদিগকে কত সুশিক্ষা দিয়া থাকে, যদি কায়মনচিত্তে পালন করিতে, তাহা হইলে তোমাদেরও এ দুর্দশা হইত না।"[১১]

ভূতের জবানীতে প্রকাশ করলেও এটি যেন ত্রৈলোক্যনাথের মনের নিজস্ব প্রতিক্রিয়া। ব্রিটিশরা আমাদের দেশ থেকে ধন লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে বিলেতে। এই খবর একটি ভূতের জানা কিন্তু সমাজের বেশির ভাগ মানুষের এই চেতনার বিকাশ হয়নি। এই খবর জনসমক্ষে আনার জন্য ত্রৈলোক্যনাথকে ভৌতিক চরিত্র তাঁর সাহিত্যে ব্যবহার করছেন; যাতে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে এই সংবাদ জনসম্মুখে পৌঁছতে পারে। তাঁর লেখার সময়কালেই ইংরেজ সরকার লাগু করেছিল 'নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন'(১৮৭৬ খ্রিঃ) । সেই আইনে বলা ছিল ব্রিটিশ বিরোধী কোনও কিছু লিখলেই তা বাজেয়াপ্ত করা হবে।

উনিশ শতকের বহু সংবাদপত্র গুলি পরস্পরের মধ্যে যে বিরাধী মনভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল । সংবাদপত্রগুলি একে ওপরের প্রতি কুৎসা রটনাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল তার নিদর্শন রয়েছে এই গল্পে-

"আমীর বলিলেন- 'আমি একখানি খবরের কাগজ খুলিবার বাসনা করিয়াছি; সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের প্রয়োজন। ডিবের ভিতর যে ভূতটি ধরিয়া রাখিয়াছি, সহকারী-সম্পাদক করিব। আর তোকে মনে করিয়াছি, সম্পাদক করিব।' গোঁগোঁ বলিল-' আমি যে লেখা পড়া জানি না । আমীর বলিলেন- পাগল আর কি! লেখাপড়া জানার আবশ্যক কি ? গালি দিতে জানিস তো ? গোঁগোঁ বলিল- ভূতদিগের মধ্যে যে সকল গালি প্রচলিত আছে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমীর বলিলেন-'... এতদিন লোকে মানুষ ধরিয়া সম্পাদক করিতেছিল, কিন্তু মানুষের যা গালি জানে, মায় অশ্লীল ভাষা পর্যন্ত, সব খরচ হইয়া গিয়াছে; এখন দেশশুদ্ধ লোককে ভূতের গালি দিব।"[১২]

ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্যে যেমন মিশে আছে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, তেমনি আছে গগনভেদি কল্পনার কারুকাজও। তিনি একদিকে কল্পনা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন চমকপ্রদ আজগুবি-উদ্ভট আখ্যান ও ছোটগল্প, অন্যদিকে তীব্র শ্লেষের সঙ্গে সাহিত্যে এনেছেন কশাঘাতে জর্জরিত নির্মম সমাজ সমালোচনা। নাকেশ্বরী ও ঘ্যাঁঘোঁ ভূতের বিবাহের অনুষ্ঠানে সমস্ত ভূতেদের আমীর নিমন্ত্রণ করার প্রস্তাব দেয় লুল্লুকে। এই প্রস্তাবে লুল্লুর দ্বিমতের প্রতিক্রিয়া যেন উনিশ শতকেরই সমাজের চিত্র-

> "...তবে কিনা, আমরা ভারতীয় ভূত, ভারতের বাহিরে আমরা যাইতে পারি না। সমুদ্রের অপরপারে পদক্ষেপ করিলে আমরা জাতিকুল-ভ্রষ্ট হইব। আমাদের ধর্ম কিঞ্চিত কাঁচা। যেরূপঅপক্ক মৃত্তিকাভান্ড জলস্পর্শে গলিয়া যায়, সেই রূপ সমুদ্র পারের বায়ু লাগিলেই আমাদেরধর্ম ফস্ করিয়া গলিয়া যায়, তাহার চিহ্নমাত্র থাকে না, ধর্মের গন্ধটি পর্যন্ত আমাদের গায়েলাগিয়া থাকে না।"[১৩]

দুর্ভিক্ষের সময়ে গাজরের চাষ করে দেশবাসীর ক্ষুধা নিবারণের নূতন সম্ভবনাও তিনিইপ্রথম আবিষ্কার করেন। বই লিখে এবং অন্যান্য উপায়ে ভারতের রপ্তানিযোগ্য কাঁচামাল এবং ভারতে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যের পরিচয় তিনি বিশ্বের সামনে তুলে ধরলেন। এই সময় বিদেশের বাণিজ্য সভায় ভারতের পক্ষে উপস্থিত থাকবার আহ্বান এলো ত্রৈলোক্যনাথের কাছে; কিন্তু ব্রাহ্মণ পন্ডিতের সন্তান- সমুদ্রযাত্রায় আত্মীয়দের বাধা এড়াতে পারলেন না। সর্বশেষে দেশের উন্নতির কথা ভেবে সংস্কারের এই শেষ বন্ধনটিকেও তিনি ছিন্ন করেছিলেন। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে বিলেতে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ত্রৈলোক্যনাথ উপস্থিত হন। উনিশ শতকে ভারতীয় সমাজে সমুদ্র যাত্রা করা পাপ বলে মনে করা হত। ত্রৈলোক্যনাথ যেন 'লুল্লু' গল্পে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের উপলব্ধি ব্যক্ত করেছেন।

উনিশ শতকের নগর সমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাবু সমাজের জন্ম দিয়েছে। তারা ইউরোপীয় জ্ঞান পদ্ধতি ও তাদের রীতিনীতি গ্রহণ করতে বেশি আগ্রহী ছিল। অন্যদিকে তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক রীতিনীতি গুলো ভুলতে শুরু করে। নব্য বাবুদের সমাজে বিশৃঙ্খল আচরণের প্রতি অতিষ্ট হয়ে এই সময় কালে বহু লেখকই নববাবুদের তাঁদের লেখায় তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮) তাঁর 'নববাবুবিলাস'(১৮২৫), নববিবিবিলাস (১৮৩১) নকশায়,প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) তাঁর 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়'(১৮৬২), মাইকেল মধুসূদন দত্ত(১৮২৪-১৮৭৩) 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) প্রহসনে এই নব্য বেঙ্গল গোষ্ঠীর বাবুদের কেচ্ছা উন্মোচিত করেছেন। ত্রৈলোক্যনাথও এই নব্য বাবুদের উদ্ভট আচরণের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন ভূতের ভণিতার মাধ্যমে। বাবুদের সম্পর্কে একটি ভূত বলছেন-

> "... আমার অবধ্য, সেই ইংরেজি পড়া বাবুলোক। তাঁহাদের ভয়ও করি, ভক্তিও করি! ভয় করি পাছে মহাপ্রভুরা গায়ে টলিয়া পড়েন, কি বমন করিয়া দেন। ভক্তি করি কেন না, এটা সেটা খাইয়া তাঁহাদের মনের কোঁচঙা ঘুচিয়া যায়, মন সরল হইয়া যায়, এই মর্ত্যলোকেই তাঁহারা সদাশিবত্ব প্রাপ্ত হন, অন্য লোকের মত তাঁহাদের মন জিলেপির পাক-বিশিষ্ট নয়।"[১৪]

জোনাথান সুইফ্ট(১৬৬৭-১৭৪৫) 'গালিভারস্ ট্রাভেল্স' (১৭২৬) লিখেছিলেন রাজনৈতিক দিক থেকে, ইউরোপের সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সমাজ ব্যবস্থা বোঝাতে। কোনও একটি কারণে শিশুরা এই ধরনের কাহিনি গুলিকে বেশি পরিমানে পছন্দ ও গ্রহণ করছে। শুধুমাত্র শিশুদের জন্য লেখা নয়, তাঁরা শিশুপোষক উপাদান ব্যবহার করছেন সরাসরি কিছু বলতে না

পারার জন্য। কাহিনিতে ভূত বা অলৌকিক উপাদান থাকা মানেই তা শিশু সাহিত্য নয়। সকলে ব্যবহার করতে পারে তা এমন সাহিত্য।

ত্রৈলোক্যনাথের পরবর্তী যে গল্পগুলি আলোচনা করা হয়েছে তাতে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ভূত বা ভৌতিক চরিত্র গুলিকে সমাজের অঙ্গীভূত বলে বোধ হয়। সামাজিক নানা আচার-আচরণ, সংস্কার, সমসাময়িক কোনো ঘটনা ইত্যাদিকে গল্পে স্থান দেওয়ার জন্য তিনি নিজের গল্পে ভৌতিক চরিত্রের অবতারণা করেছেন। তারা অনেকাংশে মানুষের সহায়ক হিসেবে সমাজে নিজেদের ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও ত্রৈলোক্যনাথ এমন কয়েকটি গল্প লিখেছেন যা রোমহর্ষক। এই সকল গল্পের ভূতেরা মানুষের সাহায্য করে না। উপরন্তু ভয় দেখায় । ভূত সম্পর্কিত যে ভয় মানুষের মধ্যে প্রচলিত সেই ভয়কেই গল্পের মূল রস হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এমনই একটি গল্প 'ভূতের বাড়ী' ।

এই গল্পে যে সব ভূতের সঙ্গে পরিচয় হয় তারা আগের গল্প গুলির মতো শরীর যুক্ত নয়। ভূত গুলি এখানে অতৃপ্ত আত্মা। অপঘাতে মৃত্যু হবার পর সেই বাড়িটিতেই অবস্থান করেছে তারা। এই গল্পে ভূতের সংখ্যা কত তা গল্পে লেখক একবারও বলেননি। টম সাহেব কেবল শরীরের ছায়া দেখেছেন । সেই ছায়া তাকে বহুবার চেষ্টা করেছে হত্যা করার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভূতকে তিনি দেখতে পাননি। জনরব শোনা যায় যে , টমের পূর্বে কেউ সেই বাড়ী থেকে জীবিত অবস্থায় ফিরতে পারেনি। সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ভূতেরা নিজেদের রাজ্যে মানুষদের প্রবেশ করতে দিতে চায় না। তাই একে একে সেই বাড়িতে আসা

সব মানুষকে ভূতেরা হত্যা করেছে ও তাদের আত্মা ভূতে পরিণত হবার পর ভূতেদের দলে যোগ দিয়েছে।

'কেন এত নিদয় হইলে' গল্পটি মুক্তমালা' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত । এই কাহিনীর দ্বিতীয় অধ্যায়ে নটবর দাস কেন এত নিদয় হইলে গানটির প্রদত্ত করার জন্য বাগান বাড়িতে থাকতে আসেন কিন্তু রাতের বেলা সেখানে অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যা দেখে নটবর দাস ও তার চাকর সেই রাতেই বাগান বাড়ি থেকে পালায়। আশোকবৃক্ষের উত্তরদিকে দুজন কৃষ্ণবর্ণ কাপড়ে আবৃত্ত দুটি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। ভালো করে প্রত্যক্ষ করার পর নটবর দেখতে পায় তাদের চোখের ভেতর থেকে গন্ধকের অগ্নির মতো নীলরঙের অগ্নিশিখা বেরোচ্ছে। এরপর তাদের মুখ যখন স্পষ্টভাবে দেখতে পায় নটবর সে বাকশক্তিহীন হয়ে পড়ে। কৃষ্ণকার কাপড়ে আবৃত কোনও মানুষ নয়, তার মুখে মাংস বা চামড়া বলতে যা বোঝায় তার লেশমাত্র ছিল না; কেবল কঙ্কাল শরীর সেই কঙ্কালের চোখ থেকে নীল বর্ণের আলো নির্গত হয় যা দেখে ভীত হয়ে পড়ে।

রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ভূতেদের উপদ্রব বাড়তে থাকে। ঘরের দরজা জানালা আপনা থেকে খুলে যায়। নটবর ও তার চাকর যেখানে বসেছিল সেখানে নরমুণ্ডের ছড়াছড়ি, এই প্রসঙ্গে নটবরের অভয়বাণী ভূতের চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে খুব সহায়ক-

"ভূতে মানুষ খায় না, ভয় কি? রাম রাম বল।"[১৫]

রাম নামের অভয়বাণী ও তাদের ভূতের জ্বালাতন থেকে মুক্তি দিতে পারে না। এই বাগান বাড়িতে যারা আসে সকলের সঙ্গে এমনই ঘটনা ঘটে। এহেন ভূতের উপদ্রবও নটবর সহ্য করে নিচ্ছিল। কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে ভূতের করুণ সুরে গান ভেসে আসছে-

"কেন এত নিদয় হইলে

অবসান নিশি, অস্ত গেল শশী

দাসীরে ভুলিয়া নাথ কোথায়?"[১৬]

এই গল্পে যে দুটো ভূতের প্রসঙ্গ এসেছে তারা এককালে এইবাড়ির হিন্দুস্থানী চাকর ও চাকরানী ছিল। বাড়ির মালিকের ছেলে গয়না চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে তারপর আত্মহত্যা করে ভূত হয়ে যায়। এই বাড়ি মালিকের কারণে যেহেতু তাদের মরতে হয়েছিল তাই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এই বাড়িতে যারায় আসে সকলের উপদ্রব করে তাড়িয়ে দেয়।

নটবরের মতোই নবীনবাবু ও তার স্ত্রী এখানে থাকতে এসেছিল। বেশিরভাগ সময়েই নবীন তার স্ত্রীকে ছেড়ে কলকাতায় চলে যেত। আসলে নবীন জানত এই বাড়িতে ভূতের উপদ্রব তাই নিজের স্ত্রীকে সেইখানে আনে তাকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে। ভূতের জ্বালাতনে যখন স্ত্রীর মৃত্যু হয়না, তখন নবীন তাকে হত্যা করে। হত্যার করার আগের মুহূর্তে স্ত্রী " কেন এত নিদয় হইলে" এই গানটি গাইছিল। নবীনবাবুর স্ত্রী মৃত্যুর পর ভূত হয়ে যায় এবং প্রতিরাতে এই গানটি করে।

কীভাবে নবীনের স্ত্রীর মৃত্যু হয় তা দেখানোর জন্য মালিক নটবরকে রাতের দ্বিপ্রহরে বাগানে আনে-'প্রতি রাতেই মৃত্যুর মুহূর্তগুলিকে দেখা যেত।' সেদিন রাতে মালী ও নটবর ছাড়াও সেখানে নবীন এসে উপস্থিত হয়। মরে গিয়েও নবীনের স্ত্রী পতিধর্ম পালন করে। মালীর মৃত্যুর সময় কথা দিতে বলে যে নবীনের এই অপরাধের কথা যেন কেউ না জানতে পারে। ভূত হওয়ার পরও সে কারোর ক্ষতি করেনি। এমনকি নবীনকেও সে ক্ষমা করে দেয়। অন্য দুই ভূত থেকে এখানেই তার পার্থক্য। নবীন পালাতে গিয়ে জলে পড়ে গেলে তখনও তার নির্দেশে মালী নবীনের প্রাণ বাঁচাতে যায়। কিন্তু জলে ডুবে মালী ও নবীন দুজনের মৃত্যু হয়। এছাড়াও নিজের বোনকেও সে সাহায্য করেছিল যাতে নবীনের সঙ্গে তার বিবাহ না হয়। গল্পের বাক্য নটবরের ভাষায়-

> "ভূতের কৃপায় আমি মনের মতো স্ত্রী রত্ন লাভ করিয়াছি। ইংরেজি খাঁ বাবুদিগের সুমতি হউক, ভূতের প্রতি তাহাঁদিগের ভক্তি হউক।"[১৭]

'বেতাব ষড়বিংশতি' গল্পটি 'মুক্তামালা' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত। গল্পে লেখক যে চরিত্রের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করান তিনি হলেন গৌরীশংকর। তার পেশা ছিল শিক্ষকতা কিন্তু সে কষ্ট করে নয়; হঠাৎ রাতারাতি ধনী মানুষ হতে চায়। একথা বলা বাহুল্য যে রাতারাতি বড়লোক হতে গেলে অবশ্য তা সৎ পথে হওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র তা অসৎ পথে তা সম্ভবপর। কিন্তু অসৎ পথ বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ। এই অসৎ পথে যাওয়ার ফলে মানুষের যা থাকে সেটিও সে হারিয়ে ফেলতে পারে। এমনই একজন চরিত্র গৌরীশঙ্কর। রাতারাতি ধনী হওয়ার বাসনার ফলে তার জীবনে কতখানি বিপর্যয় এনেছিল তা এই গল্পে দেখা যায়।

গৌরীশঙ্কর শবসাধনা শুরু করেন সর্পদংশনে মৃত একজন চান্ডালের শব দেহ নিয়ে। কিন্তু এই শবসাধনা সম্পর্কে তার পূর্ব কোনও জ্ঞান ছিল না। গল্পের মধ্যে লেখক বার বার উল্লেখ করেছেন যে, শবসাধনা করার জন্য দীক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু গৌরীশঙ্করের ভয়ঙ্কর লোভের কারণে সে কোনও গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেনি। তার সংশয় ছিল তার গুরু তাকে ঠকাতে পারে। এই লোভের মোহ তার জীবনে ভয়ঙ্কর সর্বনাশ ডেকে আনে। নানা লোকের কাছে শবসাধনা সম্পর্কে কিছু জ্ঞানও সে আহরণ করে। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে যে,- 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী' অর্থাৎ অল্পজ্ঞান ভয়ঙ্কর। গউরীশঙ্করের ক্ষেত্রে তাই ঘটে। অমবস্যার রাতে সাধনা শুরু হয়। একে একে ভূত, প্রেত, দানব, ডাকিনী, বাঘ,সাপ এসে তাকে সাধনা থেকে ভঙ্গ বিরত করার চেষ্টা করে। তাছাড়া নানারকম মায়া তার সাধনা ভঙ্গের চেষ্টা করে-

> "বহুকাল পূর্বে মৃত পিতা ও জ্ঞাতি গনও আসিয়া তাঁহাকে শবের উপর হইতে উঠিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু গৌরীশঙ্কর উঠিলেন না। নানারূপ বিভীষিকা দর্শনে তাঁহার হৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত হইল না।"[১৮]

থিয়েটার বীর রূপি বেতালের অমানবিক চিৎকারে রাত তিন'টের সময় তার সাধনা ভঙ্গ হয়। তারপর থেকেই শুরু হয় গৌরীশঙ্করের অতিরিক্ত লোভের মানসিক শাস্তি। কোনো ওঝা, পন্ডিত কেউ তার ভিতর থেকে এই বেতালকে বের করতে পারেনি। প্রতিদিন রাত তিন'টের সময় তার পিঠে এই থিয়েটার রূপী ভূত প্রহার করত,-

> "রাত্রি তিনটার সময় ভূতের ভূতে তাঁহার পিঠে গুপ্-গাপ্ গুপ্ কিল মারে। আধ ঘন্টা পরে কিলের শব্দ থামিয়া যায়। গৌরীশঙ্কর তাহার অনেকক্ষণ পর্যন্ত গোঁ-গোঁ শব্দ করিতে থাকেন ও সেই সময় তাঁহার মুখ হইতে রক্ত মিশ্রিত ফেনা নির্গত হইতে থাকে।"[১৯]

দীর্ঘ তিন বছর তার ওপর ভূতের অত্যাচার চলে। নানা ঠাকুরবাড়ি, তীর্থস্থান ঘুরেও গৌরিশঙ্করের মাতা, পুত্রের এই কষ্ট নিবারণ করতে পারেনি। কিন্তু হরিদ্বারের গিয়ে জ্বালাপুরের নিকট স্থানে একজন লোকের সঙ্গে তার মাতার পরিচয় হয়। এই বাঙালি লোকটির প্রচেষ্টায় গৌরীশঙ্করের মধ্যে বসবাসকারী ভূত তার শরীর ত্যাগ করে চলে যায়।

ভালো করে বিচার করলে জানা যাবে গল্পটি অনেকক্ষেত্রে নীতিশিক্ষামূলক। অতিরিক্ত লোভ এবং তার কারণবশত উপযুক্ত শাস্তি, আবার লেখক এই গল্পের মধ্যে দেখিয়েছেন পৃথিবীতে অশুভ শক্তি যেমন- ভূত আছে তেমনই শুভ শক্তিও বর্তমান। এই শুভ শক্তির কারণেই দীর্ঘ তিন বছর পর গৌরীশঙ্কর আরোগ্যলাভ করেন। লোকসাহিত্য ধারার লোককথার সঙ্গে এই গল্পটির মিল পাওয়া যায়। 'বিক্রম বেতাল' নামক লোককথায় রাজা বিক্রমের ভুল কাজ করার জন্য বেতাল তার পিছু নেয় এবং তার এই ভুল কাজে শাস্তি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বেতাল তার পিছু ছাড়েনি। গৌরীশঙ্করের কাহিনিটিও অনেকটাএই ধরনের।

'পূজার ভূত' ত্রৈলোক্যনাথের অন্যতম সার্থক গল্প। এটি 'মজার গল্প' গ্রন্থের অন্তর্গত। বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর ভূতের গল্পের অন্যতম। ভূতের গল্প, কিন্তু এর রস ভৌতিক রস নয়। এ হল কৌতুক রস। তাঁর এই ভূত গুলির সঙ্গে পরিচয়ে পাঠকের মনে ভীতির সঞ্চার হয় না। তাঁর কারণ তাঁদের মানবস্বভাব।

সেকালের জমিদারের ঐশ্বর্যয়ের দাম্ভিকতার পরিচয় বহন করেছে গল্পটি। প্রচুর সম্পত্তি থাকার কারণে বহু জমিদারেরা পূর্বে তাদের বাড়ির মেয়েদের বিবাহ দিতেন ঠিকই কিন্তু তাদের শ্বশুরবাড়ি পাঠাত না। সেই সময়ে এরকম একটা প্রথা বা জনরব ছিল তাতে মান হানি হয়। এমনই একজন ভাব ধারায় বিশ্বাসী জমিদার হলেন জগমোহন চৌধুরী। তিনি জেদ করেছিলেন তার জামাতাকে ঘরজামাই করে রাখবেন। জামাতা তাতে রাজি না হওয়ায় তিনি জামাতা ও কন্যাকে বিতাড়িত করেন। তার কন্যা রামমনি পিতার আদেশ অমান্য করে শ্বশুরালয়ে যায়। এই ঘটনায় মর্মাহত হয়ে জমিদার জগমোহন তাকে আজন্মের মতো তাহ্য করে দেয়। গল্পের কাহিনির মাধ্যমে জানা যায় যে সে সময়কার জমিদারদের কাছে তাদের মান-সম্মানই ছিল সবচেয়ে বড়। সম্মান রক্ষা বা নিজেদের কথাতে অনড় থাকার জন্য তারা যে কোনও ধরনের অপরাধ করতে পিছুপা হত না। দুর্গাষ্ঠমীর তিথিতে জগমোহন নিজের ক্রোধ সংবরণ করতে না পারায় বেহালা দিয়ে মেরে রামমনির কন্যার মাথা ফাটিয়ে দেয়-

> "ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া তিনি বেহালার বাড়ী কন্যার মাথায় মারলেন।"[২০]

রামমনির স্বামীর মৃত্যুর পর সে তার কন্যাকে নিয়ে জগমোহন অর্থাৎ তার বাপের বাড়ী আসে। কিন্তু জগমোহন নিজের অপমানের কথা ভুলতে না পারায় রামমনির ও তার কন্যা কে মেনে নেয়নি। বরং তাদের সেখান থেকে বিতারিত করে দিয়েছিল । এই ঘটনার ফল স্বরূপ রামমনি ও তার কন্যার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে রামমনি তার পিতা কে অভিশাপ দিয়েছিল –

> "বাবা! তুমি এ কাজ করিলে! যাহা হউক, আমি তোমাকে কিছু বলিব না। কিন্তু আজ হইতে তোমার লক্ষী ছাড়িল।"[২১]

যার ফল স্বরূপ জগমোহনের সর্বস্ব ধনও যেন লক্ষীকে ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে যায়। তাদের অতৃপ্তি আত্মা মুক্তি পায়নি। এমনকি পিণ্ডদানের পরেও সে মুক্তি ঘটেনি। জগমোহন এবং রামমনি ও তার কন্যার মৃত্যু যেহেতু সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মে হয়নি তাই মৃত্যুর পর ঘরের মধ্যেই বিচরন করে তারা । প্রায় প্রতিরাতে বিশেষ করে দুর্গাষ্টমীর রাতে জগমোহনের বেহালার আওয়াজ শোনা যায়-

"কত শতবার আমি সেই বেহালার শব্দ শুনিতে লাগিলাম।"[২২]

কিন্তু ভূত হয়ে তারা কারও ক্ষতি করেনি। উপরন্তু সীতাকে শামীমাসির হাতে তুলে দেয় জীবন্ত অবস্থায়। একমাত্র সীতায় ভূতকে দেখতে পেত। বেহালার আঘাত লাগার কারণে মৃত্যুর পরও রামমনির কন্যার মাথা থেকে রক্ত ঝরতে থাকার অনুষঙ্গটি যেন যুগ যুগান্তরব্যাপী তাদের ওপর হওয়া অত্যাচারের পরিচয় বহন করে। তাইতো প্রতি দুর্গাষ্টমীর রাতে তাদের মৃত্যুর ঘটনার পুনরাবৃত্তির দৃশ্য দেখা যায় এবং সেই মেয়েটির মাথা থেকে রক্ত পড়ার দৃশ্যটি বার বার ঘুরে ফিরে আসে- 'মেয়েটির মাথায় কে মারিয়াছে, মাথা হইতে গাল বহিয়া রক্ত পড়িতেছে।' অন্যদিকে জগমোহন হলেন অত্যাচারী জমিদার শ্রেণীর প্রতীক। তাই চিরকাল তার অত্যাচারের পরিচয় সে বহন করে চলে। একটা কথা বলা খুবই প্রয়োজনীয় যে, সে যেমন অত্যাচারীর প্রতীক ঠিক তেমনই ভাবে অত্যাচার কারীদের শাস্তি কীভাবে হয় সে নীতিশিক্ষারও পরিচয় বাহক।

'পিঠে পার্ব্বণে চীনে ভূত' গল্পটি 'মজার গল্প' গ্রন্থের অন্তর্গত। এর পূর্বে ত্রৈলোক্যনাথের যে সকল গল্পগুলি আলোচিত হয়েছে সেখানে সকল ভৌতিক চরিত্র গুলি ছিল

দেশীয়। এখানে লেখক একজন চীনা ভূতকে এনেছেন দেশীয় পটভূমিতে। গল্পের ভূতের চেহারা চীন দেশের মানুষের মতো। মৃত্যুর পরও ভূত হয়ে তার চেহারার কোনও পরিবর্তন হয়নি। রাধামাধবের মামা তার পচা হাতের চিকিৎসা করে এবং ডান হাতটি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ায় তা কেটে দিতে হয়। রাধামাধবের মামার প্রধান শখ ছিল রুগীর কাটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চয়। কিন্তু চীনা মানুষটি প্রথমে তার কাটা হাত তাকে দিতে রাজি হয়নি। কারণ চীনদেশের মানুষেরা হাত পা কাটা অঙ্গকে ভীষণ ভয় পায়। তারপর তার চিন্তার আরেকটি কারণ ছিল সে ঠুঁটো অর্থাৎ অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরলোক যেতে সে চায় না।

রাধামাধবের মামা তাকে আশ্বাস দেয় তার মৃত্যু পর্যন্ত হাতটিকে সঞ্চিত রাখার।কবর দেওয়ার সময় সেই হাতটি ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু আগুন লাগার কারণে রাধামধবের সঞ্চিত সেই কাটা অঙ্গগুলির সঙ্গে চীনে লোকের হাতও পুড়ে যায়। তাই অসম্পূর্ণ অবস্থায় চীনে লোকটিকে কবর দেওয়া হয়। যেহেতু তার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি তাই সে ভূত হয়ে রাধামাধবের মামার ঘরে উপদ্রব শুরু করে। প্রতি রাতে সে নিজের হাত ফেরত নিতে আসে এবং রাধামধবের মামাকে ভয় দেখায়। রাধামাধব ভূতেদের একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন-

> "ভূতদিগের দৃষ্টিশক্তি প্রখর নহে তাহাদের বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ নহে। তাহাদিগকে অনায়াসে প্রতারণা করিতে পারা যায়।"[২৩]

ভূতের এই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় পাওয়া যায় যখন সে অন্য চীনেলোকের হাতকে নিজের হাত মনে করে অনন্দিত হয়ে ওঠে। চীন দেশের যুদ্ধে মৃত একজন চীন দেশীয় মানুষের ডান হাত

নিয়ে একে শিশিতে রেখে দেয় রাধামাধব। রাতে সেই হাতকে ভূত নিজের হাত মনে করে খুব খুশি হয়।

নিজের না পাওয়ার পরও ভূত রাধামাধবের মামার তেমন কোনো ক্ষতি করেনি। শুধু রোজ রাতে এসে সে নিজের হাতের সন্ধান করত। এক্ষত্রে ভূত ছাড়াও বাঙালি গৃহিণী অর্থাৎ রাধামাধবের মামির স্নেহ আর্দ্র চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে তিনি ভূতের জন্য পিঠে পুলি সাজিয়ে রাখেন। পিঠে খেয়ে এবং নিজের হাত ফেরত পেয়ে ভূতটি পরমতৃপ্তি লাভ করে এবং রাধামাধবের মামাকে মুক্তি দেয় তার উপদ্রব থেকে।

তথ্যপঞ্জি

১) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়,"বীরবালা", *ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী,*সুদেব মুখোপাধ্যায় (সম্পা), কলকাতা: কামিনিপ্রকাশালয়, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ. ৫৭৭-৫৭৮।

২) তদেব, পৃ. ৫৭৮।

৩) তদেব, পৃ. ৫৭৩।

৪) তদেব, পৃ. ৫৮৪।

৫) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়,"লুল্লু", *ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী,* সুদেব মুখোপাধ্যায় (সম্পা), কলকাতা: কামিনি প্রকাশালয়, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ. ১২।

৬) তদেব, পৃ. ২৬।

৭) তদেব, পৃ. ১৬।

৮) তদেব, পৃ. ১৫-১৬।

৯) তদেব, পৃ. ১৫।

১০) তদেব, পৃ. ১৬।

১১) তদেব, পৃ. ১৭।

১২) তদেব, পৃ.২১।

১৩)তদেব, পৃ. ৩২।

১৪)তদেব, পৃ. ১৬।

১৫)ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়,"কেন এত নিদয় হইলে", *ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী,* সুদেব মুখোপাধ্যায় (সম্পা), কলকাতা: কামিনি প্রকাশালয়, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ. ৭৮০।

১৬) তদেব, পৃ. ৭৭৮।

১৭) তদেব, পৃ.৭৭৬।

১৮) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়,"বেতাব ষড়বিংশতি", *ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী,* সুদেব মুখোপাধ্যায় (সম্পা), কলকাতা: কামিনি প্রকাশালয়, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ. ৭৯২।

১৯) তদেব, পৃ. ৭৯৪।

২০) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়,"পূজার ভূত", *ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী,* সুদেব মুখোপাধ্যায় (সম্পা), কলকাতা: কামিনি প্রকাশালয়, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ. ৬২৩।

২১) তদেব, পৃ. ৬২৩।

২২) তদেব, পৃ.৬১৭।

২৩) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়,"পিঠে পার্ব্বণে চীনে ভূত", *ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী,* সুদেব মুখোপাধ্যায় (সম্পা), কলকাতা: কামিনি প্রকাশালয়, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ.১৬৮।

তৃতীয় অধ্যায়

পরশুরামের গল্পে অদ্ভুত ও মজার ভূত

পরশুরাম ওরফে রাজশেখর বসু (জন্ম ১৬ মার্চ ১৮৮০- মৃত্যু ১৯৬০) বর্তমান শতকের প্রথম পাদের শেষ থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত ৩৫ বছর (১৯২২-১৯৫৭) যাবৎ রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুক-উইট-হিউমার-স্যাটায়ার-ধর্মী গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্পের সংখ্যা একশো।

পরশুরাম শুধুমাত্র হাসির গল্প লিখবেন বলেই কলম ধরেননি। তাঁর সমাজ সচেতনতা, দায়িত্ববোধ, সদর্থক মতিগতির পরিচয়ও পাওয়া যায়। তাঁর গল্পের বিষয় ও পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করলে এই কথা আরও পরিষ্কার হবে। পরশুরাম যখন তাঁর গল্পে মনোনিবেশ করেছেন, তখন তাঁর প্রৌঢ় বয়সে, বেঙ্গল কেমিক্যাল কোম্পানির মতো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। তিনি দেখেছেন ভারত তথা আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহ এবং তার অভিঘাত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ, চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি। দেখা দিয়েছে ব্যাপক অর্থনৈতিক মন্দা। এর পাশাপাশি ভারতেও শুরু হয়েছে জনজাগরণ। স্বাধীনতা, দেশভাগ, তেভাগা, দাঙ্গা এবং স্বাধীনতার পরবর্তীতে দেশগঠনের নামে ব্যাপক হারে চলছিল দুর্নীতি, চোরা কারবারি, লোভ-লালসার উৎকট প্রতিযোগিতা। রাজনীতির ময়দান থেকে সমাজ-সর্বত্রই চলছে দেওয়া নেওয়ার নামে অশুভ আত্মার বিচরণ। যেন কালনেমির লঙ্কাভাগ। অনেকদিন অভুক্ত থাকার পর একদল ক্ষুধার্ত কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়েছে লুটেপুটে খাওয়ার জন্য। এখানে কোথায় সুস্থতা! কোথায় নীতি-আদর্শের ছায়াপাত! সবই তো দিবে আর নিবে, মেলাবে মিলেবের রেখাচিত্র। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরশুরাম নাম গ্রহণ কত সার্থক বোঝা যায়। এ কালের পরশুরাম তো সত্যি সত্যিই কুঠার

হাতে গ্রহণ করেননি। তাই, এই পরশুরাম আবির্ভূত হলেন কলম হাতে, তিনি তাঁর লেখাকে কুঠারের মতো ব্যবহার করে, আঘাত করলেন সামাজিক- রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক শত্রুদের ওপর।

একটা ঘুমন্ত জাতিকে যদি জাগাতে হয়, তবে স্যাটায়ারের থেকে ভাল অস্ত্র আর বোধ হয় নেই। একালের পরশুরাম তুলে নিলেন এই অস্ত্র। ব্যঙ্গ বিদ্রুপে ভরিয়ে তুললেন তার গল্পের শরীর। তিনি যেন জানতেন, তাঁর লেখা সর্বস্তরে পৌঁছবে না। কিন্তু শিক্ষিত সচেতন পাঠকের মননে যদি ঠিকঠাক দাগ কাঁটা যায়, তবে তারাই দূত হয়ে পৌঁছে দেবে সেই সব বার্তা, যা দেশ গঠনে, জাতি গঠনে কাজে লাগাতে পারে। রাজনীতির উগ্রতা তিনি পছন্দ করতেন না।

বাঙালি লোভী-অলস-ফাঁকিবাজ-এমন অপবাদ বরাবরই ছিল, তাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে স্যাটায়ারের থেকে ভালো অস্ত্র আর নেই বোধ হয়। পরশুরাম যেন জানতেন, সরাসরি এসব বললে সেটা উপদেশ দেওয়া হয়। আর উপদেশ কেউ শুনতে চায় না। কেউ ফিরে দেখবে না, গায়েও মাখবে না। অতএব গল্পের আশ্রয় নিলে আর কিছু না হোক গল্পটা তো পড়বে, আর তাতেই কার্যসিদ্ধি হতে পারে। অতএব গল্প বলো। গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দাও। পরশুরামের ব্যঙ্গ গল্প উদ্দেশ্যমূলক, তাঁর রঙ্গ-কৌতুকের পিছনেও উদ্দেশ্য গোপনীয় নয়। বস্তুত বিশুদ্ধ কমেডি ছাড়া আর সর্বপ্রকার হাসি উদ্দেশ্যমূলক। এক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের গল্পের সঙ্গে পরশুরামের তুলনা করা যেতে পারে। তুলনায় দেখা যাবে মিল অমিল দুই-ই আছে। পরশুরাম ও ত্রৈলোক্যনাথ সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী পরশুরাম গল্পসমগ্র'এর ভূমিকায় বলেছেন-

"বের্গস যাকে ইন্টেলেকচুয়াল লাফটার বলেছেন, পরশুরামের হাসি তা-ই। তবে তাঁর হাসির একটা প্রধান লক্ষন এই যে, ব্যক্তি বিশেষের বা গোষ্ঠী বিশেষের গায়ে এসে লাগে না। এ হাসি ভূতের ঢিলেরে মতো সম্মুখে এসে পড়ে সকচিত ও সতর্ক করে দেয়, গায়ে লেগে ব্যাথা দেয় না। অর্থাৎ হাসির উদ্দেশ্য সাধিত হয় অথচ উদ্দিষ্ট ব্যক্তি পীড়িত হয় না... স্ত্রী শিক্ষা, ইংরেজী শিক্ষা, রাজনৈতিক আন্দোলন, ব্রাহ্মসমাজ এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যাক্তি বিশেষ এই হাসির লক্ষ্য। পরশুরামের হাসির লক্ষ্য Idea, Ideology কোন কোন বৃত্তি, ব্যবসায়, সাহিত্য ও ধর্মের ব্যভিচার ইত্যাদি... পরশুরামের দর্পণ খানা কিছু বাঁকা, দর্শক নিজের বিকৃত ছায়া দেখে বিঝতে না পেরে ভাবে ওপরের ছায়া, পেট ভরে হেসে নেয়। সামান্য অতিরঞ্জনের আমদানি করে পরশুরাম এই কাজটি সুসিদ্ধ করেছেন।"[১]

পরশুরাম তাঁর ভৌতিক গল্পগুলির মাধ্যমে যেভাবে সমাজ ব্যঙ্গ করেছেন তা দেখা প্রয়োজন। রাজশেখর বসুর 'ভূশন্ডীর মাঠে' গল্প একটি অতি জনপ্রিয় ছোটগল্প। এই গল্পটি 'গড্ডলিকা' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত। এর প্রকাশকাল ১৯২৩ সালে, ফাল্গুন ১৩৩০ বঙ্গাব্দ, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়। ভূতের গল্পের ধারায় পরশুরামের ভূতের গল্প হিসাবে 'ভুশন্ডীর মাঠ' স্বতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছে।

তিনি এই গল্পে ব্যঙ্গের সঙ্গে প্রকৃতির ও প্রেমের সহ-পরিবেশন একসঙ্গে দেখিয়েছেন। তাঁর এই কৃতিত্বের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন প্রমথনাথ বিশী। 'ভুশন্ডীর মাঠে' গল্পে বসন্ত আগমনের বর্ণনা: ভূতের রাজ্যে বসন্তের আগমনে শিবু ভূতের প্রতিক্রিয়ায় অসাধারণ কাব্যিক পরিবেশ তৈরী করেছেন পরশুরাম-

"ফাল্গুন মাসের শেষ বেলা। গঙ্গার বাঁকের ওপর দিয়া দক্ষিণা হাওয়া ঝির ঝির করিয়া বহিতেছে। সূর্যদেব জলে হাবুডুবু খাইয়া এইমাত্র তলাইয়া গিয়াছেন। ঘেঁটুফুলের গন্ধে ভুশণ্ডীর মাঠ ভরিয়া গিয়াছে। শিবুর বেলগাছে নতুন পাতা গজাইয়াছে। দূরে আকন্দঝোপে গতাকতক পাকা ফল সট করিয়া ফাটিয়া গেল, একরাশ তুলার আঁশ হাওয়ায় উড়িয়া মাকড়সার কঙ্কালের মতো ঝিক মিক করিয়া শিবুর গায়ে পড়িতে লাগিল। একটা হলদে রঙের প্রজাপতি শিবুর সুক্ষ্মশরীর ভেদ করিয়া উড়িয়া গেল...কাক গলায় সুড়সুড়ি দিতেছে, কাকিনী চোখ বুজিয়া গদ্‌গদ্ স্বরে মাঝে-মাঝে ক-অ-অ করিতেছে। একটা কট্‌কটে ব্যাঙ সদ্য ঘুম হইতে উঠিয়া গুটি গুটি পা ফেলিয়া বেল গাছের কোটর হইতে বাহির আসিল এবং শিবুর দিকে ড্যাব ডেবে চোখ মিলিয়া টিটকারি দিয়া উঠিল। একদল ঝিঁঝিঁপোকা সন্ধ্যার আসরের জন্য যন্ত্রে সুর বাঁধিতেছিল, এতক্ষনে সঙ্গত ঠিক হওয়ায় সমস্বরে রিরিরিরি করিয়া উঠিল।

শিবুর যদিও রক্ত মাংসের শরীর নাই, কিন্তু মরিলেও স্বভাব যাইবে কোথা। শিবুর মনটা খাঁখাঁ করিতে লাগিল। যেখানে হৃদপিন্ড ছিল সেখানটা ভরাট হইয়া ধড়াক ধড়াক করিতে লাগিল।"[২]

এই বর্ণনার মাধ্যমে অশরীরী ভৌতিক রোমান্সের পরিবেশ তৈরি করেছেন লেখক যা বাংলা সাহিত্যে নিঃসন্দেহে বিরল কৃতিত্ব। ভূত হয়েও মানুষের মতো প্রেমের চাহিদা শিবুর মনে জেগে ওঠে।

কাহিনীর যারা চরিত্র তাদের চেহারায় ভৌতিক ছাপ থাকলেও বেশীর ভাগই জীবিত অবস্থায় যে চেহারা ছিল তার বিকৃত রূপ। ভূত হিসাবে তাদের যেন চেনা যায় তাই গল্পকার তাদের দৈহিক বর্ণনায় কিছু কিছু ভৌতিক পরিবর্তন এনেছেন। ভূতেদের মধ্যে বিবাহ ঘটিত সমস্যাকে নিয়ে মূলত গল্পটি রচিত।

গল্পে দেখা যায় ভূতেদের চাঁদের হাট বসেছে। ভূত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সকলেই সেখানে উপস্থিত, যেমন- ব্রহ্মদৈত্য, যক্ষ, ভূত, শাঁকচুন্নি, ডাকিনী, পেত্নী ইত্যাদি। এদের মধ্যে গল্পের প্রধান চরিত্র শিবু, যে পরে ব্রহ্মদৈত্য হয়ে বেলগাছে আশ্রয় নেয়। শিবু পেনেটি গ্রামের বাসিন্দা। তার স্ত্রী নিত্যকালী। নিত্যকালীর সঙ্গে ঝগড়া করে সে কলকাতায় পালিয়ে যায়। গ্রামে ফিরে এসে ভেদবমি হয়ে মারা যায় ; এবং সে ভূশন্ডীর মাঠে আশ্রয় নেয়। দু-তিন মাস একা থাকার পর তার নিত্যকালীর কথা মনে পড়ে আর ক্রমশ মনটা খাঁ খাঁ করতে থাকে । কিন্তু লোকলজ্জায় সে পেনেটি গ্রামে যেতে পারে না ; এ প্রসঙ্গে তার বক্তব্য – " লোকে বলিবে বেটা ভূত হইয়াও স্ত্রীর আঁচল ছাড়িতে পারে না।"[৩]

শিবু বর্তমানে ব্রহ্মদৈত্য; কিন্তু ব্রহ্মদৈত্য সুলভ আচরণ তার মধ্যে দেখা যায় না। এখানে দেখা যায় যে শিবু অর্থাৎ বর্তমানে ব্রহ্মদৈত্যেরও বাস্তব জগতে থাকা সাধারণ মানুষের মতো সমাজ ও লোকলজ্জা রয়েছে। যা মৃত্যুর পরও যায়নি। ব্রহ্মদৈত্য হওয়ার পর সে অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তার আচরণ মানুষের মতোই। তাই এই চরিত্রটিকে বোধ হয় পরশুরাম বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের টাইপ চরিত্র হিসাবে এঁকেছেন। স্ত্রী না থাকায় তার বড়ই একা বোধ হয় । তাই সে নতুন সঙ্গীর খোঁজে বেরোয়। শ্যাওড়া গাছের পেত্নী শাকচুন্নির সঙ্গে পরিচয় হলেও তার মন হরণ করে এক ডাকিনী। এই ডাকিনী আর কেউ নয় তার স্ত্রী নিত্যকালী; এক্ষেত্রে বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের কথা উঠে আসে। মধ্যবিত্ত পরুষরা যতই সেচ্ছাচারে লিপ্ত থাকুক না কেন গৃহের প্রতি তার চিরকাল নাড়ির টান বর্তমান। তাই তো শিবুর মন আবার নিত্যকালীর প্রতি আকর্ষিত হয়। সাধারণ মানুষের মতোই শিবু সঙ্গী খোঁজে। সামাজিক জীব হয়েও একজন মানুষ আরেকজনের সাহায্য ব্যতীত বাঁচতে পারে না । শিবুর ক্ষেত্রেও তেমনি, একাকীকত্ব যে ভূতেদেরও থাকতে পারে তা শিবুর মাধ্যমে

জানতে পারা যায়। বাংলা সাহিত্যের ভূতের গল্পে আর কোথাও এইরকম নিদর্শন নেই বললেই চলে। যেখানে ভূত আবার সঙ্গী খোঁজার মাধ্যমে যেন মানুষের মতো করেই বাঁচতে চেয়েছে ভূত সমাজে।

ডাকিনীর বর্ণনায় দেখা যায় ভুশণ্ডীর মাঠের পূর্বদিকে গঙ্গার ধারে ক্ষীরী বামনীর পরিত্যক্ত ভিটায় নিত্যকালী আশ্রয় নিয়েছে। খেজুরের ডাল দিয়ে সে ঘর পরিষ্কার করছে। এগুলো ভূতের করবার কথা নয় । ঘরের গৃহিণী এগুলি করে। কিন্তু বাংলাভাষায় একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে 'ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে ' তাই হয়ত নিত্যকালী ডাকিনী হওয়ার পরও সাধারণ গৃহিনীর মতো গৃহস্থালীর কাজ সম্পন্ন করে।

এই গল্পের মূল বিষয় মধ্যবিত্ত পরিবারের দাম্পত্য কলহ। তাই তো কেলোভূত হোক বা যক্ষ সকলেই স্ত্রীর দাপটে অতিষ্ট। কেলোভূতের বাড়ি ছাপড়া জেলায়। তার স্ত্রী মংরি অত্যন্ত বদমেজাজি। মংরির সঙ্গে ঝগড়া করে কলকাতায় পালিয়ে আসে। কিছুদিন পরে মংরি বসন্ত রোগে মারা যায়। আর যক্ষরও প্রায় একই অবস্থা। যক্ষের চেহারা অনেকটা বাঙালী গৃহস্থের, সে আমাদের চেনা জগতেরই লোক বলা যেতে পারে। তার পড়নে ধুতি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তার নাম নদের চাঁদ মল্লিক, পদবী বসু, জাতিতে কায়স্থ। তার স্ত্রী তার পিঠে এক ঘা চেলা কাঠ মেরে বাপের বাড়ি পালিয়ে যায়, সাতচল্লিশ সালের মোড়কে স্ত্রীর মৃত্যু হয়। এখানে প্রত্যেকটি চরিত্র মধ্যবিত্ত সমাজের অনুসারী এই প্রসঙ্গে যক্ষের উক্তি- 'সব স্যাঙাতের একই হাল দেখছি।' অনেক অনুরোধের পর ডাকিনী শিবুর সঙ্গে বিবাহ করতে রাজি হয়। কিন্তু বিবাহের দিন শিবু জানতে পারে ডাকিনী আসলে নিত্যকালী। এইসময় পাঠক জানতে পারে যে শিবু ডাকিনী, শাঁকচুন্নি ও পেত্নীর তিন জন্মের স্বামী আর নিত্যকালী শিবু, কেলোভূত ও যক্ষের

তিন জন্মের স্ত্রী। এক্ষেত্রে লেখক পরশুরাম আমাদের হিন্দু সমাজে প্রচলিত বিবাহ সম্পর্কিত সংস্কারের উল্লেখ করেছেন। যে একবার বিবাহ হলে সাত জন্মের জন্য তারা স্বামী-স্ত্রী হয়ে যায়। কিন্তু তারা যখন জানতে পারে যে তারা মৃত্যুর পূর্বে একে অপরের স্বামী-স্ত্রী ছিল তখন তাদের সকলের মধ্যে প্রচন্ড ঝগড়া বেধে যায়। লেখক এই কলহ থামাবার দায়িত্ব দেন শরৎ চাটুজ্যে, চারু বাড়ুজ্যে, নরেশ সেন ও যতীন সিংহ-দের ওপর। তার কারন এরা সমাজ ও নীতি বিষয়ক সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত; সমাজের নানা সমস্যা তাদের রচনায় উঠে এসেছে। তাই এই সামাজিক দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি লেখক তাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন।

এই গল্পে লেখক ভূতের নানা বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে, যারা নাস্তিক তারা মারা গেলে নানা গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। আস্তিক সাহেবরাও মৃত্যুর পর ভূত হয়ে ওয়েটিং রুমে জমায়েত হন সেখানে তাদের বিচার হয়। তারা সাধারণ মানুষের মতোই কাজ করে। তারপর তারা স্বর্গে অথবা নরকে যায়। শিবু মৃত কিন্তু তার আচরণগুলি মানুষের মতো,-

> "ভূশণ্ডীর মাঠের প্রান্তস্থিত পিটুলি-বিলের ধারে শ্যাওড়া গাছে একটি পেত্নী বাস করে। শিবু তাহাকে অনেকবার সন্ধ্যাবেলা পলো হাতে মাছ ধরিতে দেখিয়াছে। তার আপাদমস্তক ঘেরাটোপ দিয়ে ঢাকা, একবার সে ঢাকা খুলিয়া শিবুর দিকে চাহিয়া লজ্জায় জিব কাটিয়াছিল। পেত্নীর বয়স হইয়াছে, কারণ তাহার গাল একটু তোবড়াইয়াছে এবং সামনের দুটো দাঁত নাই। তাহার সঙ্গে ঠাট্টা চলিতে পারে, কিন্তু প্রেম হওয়া অসম্ভব।"[৪]

মৃত্যুর পর ভূত হয়েও শিবু মানব সমাজের মতো রুচিবোধ ত্যাগ করতে পারেনি। ভূতেদের জগতে পৌঁছে সে একা হয়ে গেছে। তাই তার সঙ্গী প্রয়োজন। গল্পে ভূতেদেরও একটা সমাজ রয়েছে, তাদেরও ভাল-মন্দের বিচার বোধ রয়েছে। পেত্নীকে দেখে শিবুর পছন্দ হয় না। পরশুরাম এই গল্পে যে সব ভূতের আগমন ঘটিয়েছেন তাদেরকে মানুষেরই প্রতীকী হিসেবে

দেখাতে চেয়েছেন। তাই চরিত্ররা মৃত্যুর পরও ভূত হয়ে মানুষের মতোই আচরণ করে চলে- শিবু এখনো টিকিতে ফুল বাঁধে, নাদু মল্লিক এবং কারিয়া পিরেত ধূমপান করে, পেত্নী গোবরজল ছড়িয়ে যায় । শিবু একটি শাঁকচুন্নির সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করেছিল কিন্তু তাতে সে ব্যর্থ । শিবুর মন সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছিল এক ডাকিনী। ভূশন্ডীর মাঠে পূর্বদিকে গঙ্গার ধারে ক্ষীরী বামনীর পরিত্যক্ত ভিটায় সে থাকে। এখানে ডাকিনীর রূপ বর্ণনার অংশটি পাঠককে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে।

> "ডাকিনী তখন খেজুরের ডাল দিয়া রোয়াক ঝাঁট দিতেছিল। পরনে সাদা থান। শিবুকে দেখিয়া নিমেষের তরে ঘোমটা সরাইয়া ফিক করিয়া হাসিয়াই সে হাওয়ার সঙ্গে মিলাইয়া যায়। কি দাঁত! কি মুখ! কি রং! নৃত্যকালীর রং ছিল পানতুয়ার মত। কিন্তু ডাকিনীর রং যেন পানতুয়ার শাঁস।"[৫]

ডাকিনীকে দেখে শিবু গান শুরু করে-

> "আহা, শ্রীরাধিকে চন্দ্রাবলী
> কারে রেখে কারে ফেলি।"[৬]

যেহেতু এই সমস্ত ভূতেরা মধ্যবিত্ত সমাজেরই বাসিন্দা ছিল; তাই মৃত্যর পরও ভূত হয়ে প্রেমিকাকে প্রেম নিবেদন করছে মানুষেরই মতো করে। কেলো ভূত বা কারিয়া পিরাত এর বর্ণনা-" মাথায় পাগড়ি, কাল লিকলিকে চেহারা, কাঁকলাসের মত একটি জীবাত্মা "। কেলো ভূত গল্পের দ্বিতীয় পুরুষ ভূত। তার ভাষা হিন্দুস্তানি গোছের। তার বাসস্থান তালগাছের মাথায়। মানুষের সমাজের দুজন অচেনা লোক একজায়গায় থাকতে এলে যেমন প্রথমদিন পরিচয় পর্ব চলে ঠিক সেইভাবেই ভূত সমাজেও পরিচয় পর্ব শুরু হল। ভারতীয় সংস্কৃতিতে গুরুজনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে প্রণাম করা হয়। ভূত সমাজেও কারিয়া পিরেত তালগাছ থেকে নেমে

বলে- ‘গোড় লাগি ধরমদেওজী।’ শিবুর তামাক খাওয়া অনেকটা মানুষের মতো কিন্তু তামাক খাওয়ার সরঞ্জাম না থাকায় কচুর ডাঁটার ওপর কলিকা রেখে খায়। দুজন প্রেতাত্মার কথপকথনকালে সেখানে আবির্ভাব হয় যক্ষের । ইটের ফাঁক দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সে বেরিয়ে আসে। লেখক তার বর্ণনা দিতে গিয়ে যে উপমা প্রয়োগ করেছেন তা এইরুপ-

> “স্থূল খর্ব দেহ, থেলো হুঁকার খোলের উপর একজোড়া পাকা গোঁফ গজাইলে যে-রকম হয় সেই প্রকার মুখ মাথায় টাক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে ঘুন্টি-দেওয়া মেরজাই, পরনে ধুতি, পায়ে তালতলার চটি।”[৭]

মানব সমাজে কারোর সম্পত্তি আত্মসাৎ করলে যেমন পুলিশ হাতকড়ি লাগিয়ে নিয়ে যায়, সেভাবেই শিবু যখন সম্পত্তির খোঁজ খবর নীতে চায় যক্ষ বলে- “ওদিকে নজর দিও না, হাতে হাতকড়ি পড়বে”। জীবিতবস্থায় তার নাম ছিল নদেরচাঁদ মল্লিক , পেশা দারগাগিরি। যক্ষ সঙ্গীত প্রিয় লোক। সকলের সঙ্গে সাক্ষাতে যক্ষ জানতে পারে সংসার ধর্মে সবার একই দশা । তাই দুঃখ লাঘবের জন্য তারা গান শুরু করে-

> “ধা ধা ধিন তা কৎ তা গে, গিন্নী ঘা দেন কর্তাকে
> ধরে তাড়া ক’রে খিটখিটে কথা কয়
> ধূর্তা গিন্নী কর্তা গাধারে।
> ঘারে ধ’রে ঘন ঘন ঘা কত ধূম্ ধূম্ দিতে থাকে।
> টুঁপি টিপে ঝুঁটি ধরে উলটে পালটে ফ্যালে
> গিন্নী ঘুঘুটির ক্ষমতা কম নয়;
> ধাককা ধুককি দিতে ত্রুটি ধনী করে না
> নগণ্য নির্ধন কর্তা গাধা-
> ‘ধা’-এর উপর সম। ধিন্ তা তেরে কেটে গদি ঘেনে ধা।”[৮]

‘ভুশন্ডীর মাঠে’ গল্পে তিনজন স্বামী তাদের স্ত্রীদের গল্প বলেছে। কিন্তু তিনজন স্ত্রী তাদের স্বামীদের গল্প বলেনি। নৃত্যকালী যে তিনজন্ম ধরেই শিবুর স্ত্রী, তিন জন্মের তিন স্বামীদের মূল অভিযোগ ছিল তারা তাদের স্ত্রীদের নিয়ে খুশি নন। নৃত্যকালীর গায়ের রং মৃত্যুর পর বেশ ফর্সা হয়ে গেছে। শিবু প্রথমে তাকে চিনতে পারেনি, তখন তার মনে হয়েছিল ‘কি দাঁত! কি মুখ! কি রং!’ কিন্তু বিয়ের সময় অর্থাৎ দ্বিতীয় দর্শনে শিবু তাকে নৃত্যকালী বলে চিনতে পেরেছে। শুধু শিবু নয় কারিয়া পিরেত তাকে মংরী বলে এবং যক্ষ তাকে তার গিন্নী বলে চিনতে পেরেছে। অন্য দিকে শিবুকে পেত্নী আর শাঁকচুন্নি তাদের মানব জন্মের স্বামী বলে চিনতে পারলেও, শিবুও যে তাদের গত দু‘জন্ম ও তিন জন্ম আগের স্ত্রী বলে চিনতে পেরেছে এমন কথা গল্পে বলা নেই। একই ভাবে পিরেতকে তার দু’জন্ম বা তিন জন্ম আগের স্বামী বলে চিনতে পেরেছে এমন কোনও উল্লেখ নেই। যা বলা হয়েছে, তা হল দুজনেই এদেরকে দেখে যথেষ্ট ভয় পেয়েছে। শিবু আর নৃত্যকালীর বার বার জন্মান্তর হয়েছে, অন্তত তিন বার তো হয়েছেই। কিন্তু পেত্নী তিন জন্ম ধরে পেত্নী, শাঁকচুন্নি দুজন্ম ধরে শাঁকচুন্নি, যক্ষ তিন জন্ম ধরে যক্ষ, কারিয়া পিরেত দু’জন্ম ধরেই কারিয়া পিরেত। মনে রাখতে হবে কথক তাঁর ভূততত্ব আলোচনা করার সময় বলে দিয়েছিলেন যে ভূত হওয়ার পর কেউ দু-চার দিন পর, কেউ দশ-বিশ বছর পর, কেউ আবার দু- তিন শতাব্দী পর পুনর্জন্ম লাভ করতে পারে। ফলে সেই সূত্র ধরেই বলা যায় যে শিবু বা নৃত্যকালীর বার বার পুনর্জন্ম হয়েছে, কিন্তু পেত্নী, শাঁকচুন্নি, যক্ষ বা কারিয়া পিরেতের তা হয়নি।

জটিলতা যখন চরমে উঠেছে তখন কথক মূল গল্প পুরোপুরি থামিয়ে দিয়েছেন। এই গল্প শেষ করার কোনও ইচ্ছে তাঁর আছে বলে মনে হয়নি। তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন তা হল-

"তার পর যে ব্যাপার আরম্ভ হইল তাহা মনে করিলেও কলমের কালি শুখাইয়া যায়। শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামী- এই ডবল ত্র্যহস্পর্শযোগে ভুশণ্ডীর মাঠে যুগপৎ জলস্তম্ভ, দাবানল ও ভূমিকম্প শুরু হইল।"[৯]

তাঁর তো কলমের কালি শুকিয়ে গেছে ভয়ের চোটে ফলে তিনি কলম বন্ধ করেছেন। আমরা অনুমান করতে পারি যে 'ডবল ত্র্যহস্পর্শযোগে' কী পরিমাণ গোলমাল শুরু হয়েছে, তারপর আবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও শুরু হয়েছে। দেশি ভূত, বিলিতি ভূত, কাবুলি ভূত, চিনে ভূত যে যেখানে ছিল সকলেই এই তামাশায় অংশ নিতে এসেছে। একেবারে শেষ অনুচ্ছেদে এসে কথক এবার হাত তুলে নিলেন-

"কে এই উৎকট দাম্পত্য সমস্যার সমাধান করিবে ? আমার কম্ম নয়।"[১০]

অর্থাৎ কথক আর কিছুতেই গল্পটা শেষ করবেন না। অথচ তাঁর মতে ভূতজাতি অতি নাছোড়বান্দা, তারা তাদের ন্যায্য দাবী কিছুতেই ছাড়বে না। সুতরাং কথক এবার অন্য রাস্তা ধরলেন, তিনি কয়েকজন লেখকের নাম উল্লেখ করে, তাঁদের ওপর এই ভৌতিক দাম্পত্য সমস্যা সমাধানের ভার দিয়ে দিলেন-

"অতএব সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি-শ্রীযুক্ত শরৎ চাটুজ্যে, চারু বাঁড়ুজ্যে, নরেশ সেন এবং যতীন সিংহ মহাশয়গণ যুক্তি করিয়া একটা বিলি- ব্যবস্থা করিয়া দিন- যাহাতে এই ভূতের সংসারটি ছারেখারে না যায় এবং কোনও রকম নীতি- বিগর্হিত বিদ্‌কুটে ব্যাপার না ঘটে। নিতান্ত যদি না পারেন, তবে গয়ায় পিণ্ড দিবার চেষ্টা দেখুন, যাহাতে বেচারারা অতঃপর শান্তিতে থাকিতে পারে।"[১১]

এই গল্পে ভূতেদের বিবাহ পদ্ধতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে- শিবু সারা গায়ে গঙ্গার মাটি মেখে স্নান করে। গাবের আটা দিয়ে পইতা পরিষ্কার করে, ফণি-মনসার বুরুশ দিয়ে চুল

আঁচড়ায়; টিকিতে একটা তেলেকুচা বাঁধে। বনজঙ্গল থেকে ফুল সংগ্রহ করে ডাকিনীর ঘরের উদ্দেশ্যে রনা হয়। ভূতের সমাজের যে বিবাহের রীতিনীতি তা আমাদের চেনা জগতেরই বিবাহ রীতি। বিয়ের আগে গায়ে হলুদের অনুকরণে শিবুর গায়ে মাটি মেখে স্নান করা আর নানা উপহার নিয়ে কন্যার গৃহে পদার্পণ। কচুপাতার আসনে বসে ডাকিনীর নিজের ঘোমটা খুলে শিবুর সঙ্গে শুভদৃষ্টি একটা কৌতুকাবহ তৈরি করে।

পরশুরামের দ্বিতীয় ভৌতিক গল্প 'মহেশের মহাযাত্রা' লেখা হয় ১৯৩০ সালে। গল্পটি 'হনুমানের স্বপ্ন' গ্রন্থের অন্তর্গত। এই গল্পের কথন রীতি মৌখিক সাহিত্যের মতো। এখানে একজন কথক সমগ্র গল্পটি বলছে। কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র মহেশ মিত্তির। তিনি শ্যামবাজার শিবচন্দ্র কলেজের অঙ্কের প্রফেসর। একদিকে মহেশের ভগবান, আত্মা, পরলোক কিছুতেই বিশ্বাস নেই অন্যদিকে তার বন্ধু হরিনাথ কুন্ডু ফিলোজফির প্রফেসর, ভূতে বিশ্বাসী। দুজনে খুব ভালো বন্ধু হলেও তাদের মধ্যে বেশির ভাগ সময়েই ভূত, আত্মা, পরলোক এই নিয়ে তর্ক চলত। একদিন তর্ক বড় আকার ধারণ করে; কলেজের অন্যান্য প্রফেসররাও দুদলে ভাগ হয়ে যায়। তর্কের মূল বিষয় ভূত আছে অথবা নেই? মহেশ মিত্তির অঙ্ক করে প্রমান করার চেষ্টা করলেন ভূত নেই-

"ঈশ্বর= 0, আত্মা= ভূত=v0 ।"[১২]

বিজ্ঞানী পরশুরাম মহেশের মাধ্যমে গাণিতিক পন্থায় ভূতের অনস্তিত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাদের ভূত নিয়ে বিবাদ যখন চরম মাত্রায় পৌঁছায় তখন হরিনাথ ভূতের অস্তিত্ব প্রমান করার জন্য মহেশকে ভূত দেখাবেন এই প্রতিশ্রুতি দেয়। ভূতের দেখা পাওয়ার জন্য শিব-চতুর্দশীর দিন রাত বারোটায় মানিকতলায় নতুন খালের ধরে মহেশকে যেতে বলা হয়। মহেশকে জব্দ

করার জন্য হরিনাথ কিছু ছাত্রকে সেই স্থানে ভূত সাজিয়ে রাখে। কিন্তু মহেশ হরিনাথের ফন্দি বা কারসাজি ধরে ফেলে।'ধাঁ করে এগিয়ে গিয়ে ভূতের কাঁধ খামছে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন- কোন ক্লাস?' এই অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনার জন্য কলেজের প্রিন্সিপাল হরিনাথ ও মহেশ মিত্তিরকে সাসপেন্ড করে। মহেশ রেগে গিয়ে হরিনাথকে নিয়ে কবিতা লিখতে শুরু করে-

"হরিনাথ কুণ্ডু
খাই তার মুন্ডু।"[১৩]

আরও লিখলেন-

"হরিনাথ ওরে
হবি তুই ম'রে
নরকের পোকা
অতিশয় বোকা।"[১৪]

ইত্যাদি আরও অনেক কবিতা লিখলেন। কিন্তু তাতেও শান্তি পায় না। তিনি প্রেততত্ত্ব বিষয়ে নানা বই পড়তে শুরু করেন। যত তিনি পড়াশোনা করেন ততই ভূতের প্রতি তার অবিশ্বাস ও আক্রোশ বাড়ে। একসময় এমন হয় যে ভূতকে গালাগালি না দিয়ে তার অন্ন রুচে না। ভূতচর্চার ফলে ক্রমশ তার শরীর ভেঙ্গে পড়তে থাকে; কিন্তু এই চর্চা তাকে নেশার মতো পেয়ে বসে। এই ভাবে সাত-আট মাস পর মহেশ মিত্তির মারা যান। মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কী তাকে বিশ্বাস করাতে পারেনি যে ভূতের অস্তিত্ব রয়েছে। নিজের পৈতৃক সম্পত্তি দশ হাজার টাকা ইউনিভার্সিটিতে দিয়ে যান। যে ছাত্র ভূতের অনস্তিত্ব নিয়ে সবচেয়ে ভালো প্রবন্ধ লিখবে দশ হাজারের সুদ দিয়ে তাকে পুরষ্কৃত করা হবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। কলকাতায় মহেশের কোনও আত্মীয় না থাকায় হরিনাথকে সৎকারের দায়িত্ব নিতে হয়। পাড়ার কেউ

মহেশের সৎকারের দায়িত্ব নিতে চাওয়ায় সেই ভার নেয় হরিনাথ। এই গল্পে মহেশের অন্তিম যাত্রার বর্ণনাটি সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা। মহেশের মৃতদেহ নিয়ে তারা যখন শশ্মানের দিকে যাত্রা শুরু করে হঠাৎ মহেশের দেহের ভার বাড়তে থাকে কারও পা এগোয় না। একে একে কাল র‍্যাপার পরা লোক এসে মৃতদেহ বহনের ভার নেয়; হরিনাথ আর অন্য বাকিরা তাদের সঙ্গে হাটতে শুরু করে। কিছুক্ষন পর কাল র‍্যাপার পরা চারজন লোক দ্রুত গতিতে মৃতদেহ নিয়ে এগোতে থাকে যার ফলে হরিনাথ তাদের নাগাল পায় না।

মহেশ সারাজীবন ভূতে বিশ্বাস করেনি; ভূত যে নেই তা প্রমাণ করার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত সংঘর্ষ করে গেছে। কালো র‍্যাপার পরা লোকগুলি আসলে মহেশের ওপর প্রতিশোধ নেয় ভূতে বিশ্বাস না করার জন্য। ভূতগোষ্ঠী মহেশের ঔদ্ধত্যকে মেনে নিতে পারেনি। মহেশের মৃত্যুর পর তার শ্রাদ্ধ করতে করতে দেয়নি। মহেশ শেষ পর্যন্ত ভূতেদের ওপর বিশ্বাস করে যখন সে নিজে ভূত হয়ে যায়। হরিনাথকে সে বলে-

"ও হরিনাথ- আছে, আছে সব আছে সব সত্যি..."[১৫]

কিন্তু মৃত্যুর পর মহেশের এই বিশ্বাস ভূতগোষ্ঠীর ক্রোধকে একটুও কমাতে পারেনি। হরিনাথ বার বার পিণ্ডদান করলেও তা ছিটকে বেরিয়ে আসে। কারণ ভূতেরা সম্ভবত চায় না যে মহেশের আত্মা শান্তি পায়। তার শাস্তি স্বরূপ তাকে চিরকাল ভূত হয়ে থাকতে হবে। কলেজকে দিয়ে যাওয়া মহেশের ফান্ডের টাকাও ভূতেরা ব্যবহার করতে দেয়নি । যখনই কলেজ ভেবেছে যে সেই টাকা ব্যবহার করবে তখনই ভূতেরা ছাদে 'দুপ দাপ' আওয়াজ করে তা রোখার চেষ্ঠা করেছে।

‘বদন চৌধুরীর শোকসভা’ গল্পটি ১৯৫২(১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) সালে লেখা হয়। গল্পটি ‘ধুস্তরী মায়া’ গল্প গ্রন্থের অন্তর্গত । যার নামে এই গল্পটি বদনচন্দ্র চৌধুরী পেশায় ছিলেন উকিল। প্রায় দশ বছর কাউন্সিলার আর পাঁচ বছর বিধানসভার সদস্য ছিলেন। মৃত্যুর পর সে নরকের রৌবকের ‘গ’ বিভাগে রয়েছেন। বিকেল পাঁচটায় তার মৃত্যু উপলক্ষে ইউনিভার্সিটির ইন্সটিটিউট হলে শোকসভার আয়োজন করা হয়। বদন চৌধুরী তার নিজের শোকসভায় উপস্থিত থেকে বক্তৃতা শোনার জন্য দুই ঘণ্টার ছুটি নিয়ে মর্ত্যলোকে যেতে চায়। আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী যারা পাপকর্মে লিপ্ত তারাই নরকে যায়; অর্থাৎ বোঝায় যায় যে এখানে লেখক সে সকল রাজনৈতিক কর্মীদের উদ্দেশ্য করে গল্প লিখেছেন যারা সাধারণ মানুষের সর্বস্ব হরণ করে নিয়ে তাদের প্রতারণা করে চলেছে। বদন চৌধুরীও সেই গোষ্ঠীর একজন রাজনৈতিক কর্মী। এহেন তার শোকসভা অনুষ্ঠিত হবে । তার কয়েক দিনের ভালো আচরণ প্রত্যক্ষ করে যমরাজ তাকে দু- ঘণ্টার জন্য ছুটি দেয় সঙ্গে কাকজঙ্ঘ নামে একজন যমদূত পাঠান।

গল্পের আরেকটি চরিত্র ঘনশ্যাম ঘোষাল ‘কালকেতু’ পত্রিকার সম্পাদক। জীবিতাবস্থায় সে তার পত্রিকায় বদন চৌধুরীর নামে চিরকাল গালাগাল ও কুৎসা রটিয়েছেন। তার মৃত্যুর পর সে নরকের ‘ম’ বিভাগে স্থান পায়। যমরাজের কাছে ঘনশ্যামও দুঘণ্টার ছুটি নেয় শোকসভায় অংশগ্রহন করার জন্য। ঘনশ্যাম ঘোষাল সেই গোষ্ঠীর প্রতিনিধি যারা টাকার লোভে ভুল খবর প্রচার করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে তোলে, বদন চৌধুরীর কাছে তার কোনও সুবিধা না হওয়ায় সে নিজের পত্রিকায় সবসময় তার বিরুদ্ধে নানা খবর ছাপাত। মৃত্যুর পরও সে বদন চৌধুরীর পিছু ছাড়ে না। যমরাজ ঘনশ্যামকেও দুঘণ্টার ছুটি দেন এবং তার সঙ্গে ভৃঙ্গরোল নামক যমদূত পাঠান।

বদন চৌধুরী ও ঘনশ্যাম ঘোষাল দুজনই নরকের অধিবাসী। এখানে লেখক নরকের উল্লেখ করে বোঝাতে চেয়েছেন যে গল্পের দুজন প্রধান চরিত্র জীবিতাবস্থায় বিস্তর পাপ করেছিল। নরক ও স্বর্গকেন্দ্রিক মানুষের যে সংস্কার বা ধারণা বর্তমান তা লেখক এখানে ব্যবহার করে গল্পের শুরুতেই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে বদন চৌধুরী ও ঘনশ্যাম কেমনতর ভৌতিক চরিত্র।

শোকসভায় পৌঁছে সভার প্রধান বক্তা আঙ্গিরস গাঙ্গুলির পিছনে বদন চৌধুরী দাঁড়ায় এবং সভাপতি গোবর্ধন মিত্রের পেছনে ঘনশ্যাম ঘোষাল দাঁড়ায়। সভার সদস্যরা দেশপ্রিয় পার্কে বদন চৌধুরীর মূর্তি স্থাপনের জন্য সকলের কাছে চাঁদা আবেদন করলে কেউ রাজি হয় না । কেননা সকলে তাদের পূর্ব ঘটনা সম্পর্কে অবগত ছিল। গোবর্ধন মিত্রের বক্তৃতার সময় ঘনশ্যাম তার মধ্যে ঢুকে পড়ে-

"গোবর্ধনবাবু কানের ভিতর দিয়ে তার মরমে প্রবেশ করলেন।"[১৬]

তারপর বদন চৌধুরীর সকল পাপ কর্মের ঘড়া সকলের সামনে উপুড় করে ক্ষান্ত হন। নিজের অপমান সহ্য করতে না পেরে বদন চৌধুরী আঙ্গিরসের ভেতরে প্রবেশ করে ঘনশ্যামের জুয়াচুরিকে প্রকাশ করতে লাগল। এইভাবে দুই ভূতের মধ্যে প্রবল ঝগড়ার মাধ্যমে বাদানুবাদ চলতে থাকে; কিন্তু দুঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় যমদূতের ডাকে তারা বেরিয়ে আসে এবং আবার নরকে যাত্রা করে। শরীর থেকে প্রেতাত্মা বেরিয়ে যাওয়ার পর গোবর্ধন ও আঙ্গিরস দুজনেই মূর্ছিত হয়ে যান। সভার সকলে ভাবেন যে নেশার কারণে তাদের এই অবস্থা কিন্তু প্রেততত্ত্বের বিশারদ হারাধন দত্ত জানান-

"এ হল আসল ভৌতিক ব্যাপার মশাই আজ আপনারা স্বকর্ণে দুই প্রেতের ঝগড়া শুনেছেন।"[১৭]

এই গল্পের মধ্যে লেখক ভণ্ড রাজনৈতিক কর্মী ও সংবাদ মাধ্যমকে ব্যঙ্গ করেছেন। পরশুরামের গল্পে কিছু স্থায়ী চরিত্র আছে যারা বারবার ঘুরে ফিরে আসে। রামতারন, জটাধর বকশী, কেদার চাটুজ্যে ইত্যাদি চরিত্ররা একই আড্ডার সদস্য। এভাবে একটি নির্দিষ্ট আড্ডাকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন লেখক। আর এই চরিত্র গুলির মাধ্যমে মানুষের আচার-আচরণের অসঙ্গতি,হাস্যকর কিছু দুর্বলতাকে তুলে ধরেছেন। আমাদের স্বাভাবিক জীবন যাপনের অসংলগ্নতাকে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন নির্বিকারভাবে। এবং সে সম্পর্কে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি। কখনো কোনো গল্পে পরশুরাম নীতিকথা বলেননি। অন্তত স্পষ্ট করে তো নয়ই। পরশুরাম নিজে অন্তরালে থেকে চরিত্র গুলিকে পাঠকদের দরবারে হাজির করেছেন। তাঁদের সব রকম চারিত্রিক খুঁটিনাটিসহ। তারা নিজেদের মতো করে কথা বলেছে, হেঁটেছে, কাজকর্ম করেছে। তারা লেখকের হাতে পুতুল নয় বলেই তাদের দুর্বলতাগুলিও ঢাকা পড়েনি। তাই তারা এতটা আকর্ষণীয়, সম্পূর্ণ এবং ত্রুটিহীন। সেক্ষেত্রে শুধু মনুষ্য চরিত্র নয়, ভূতপ্রেত থেকে শুরু করে মনুষ্যেতর ছাগল, হনুমান ,বাঘ ইত্যাদি চরিত্ররাও লাগামছাড়া- স্বাধীন এবং সম্পূর্ণ। তাদেরও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে। বোধবুদ্ধি আছে। মান-অপমান আছে। সর্বোপরি আছে একটা সতেজ মন।

রাজশেখর বসুর 'কৃষ্ণকলি' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থের অন্যতম একটি গল্প হল 'জটাধর বকশী'। গল্পটি ১৩৫৯ (১৯৫২) বঙ্গাব্দে লেখা হয়েছে। গল্পের মুখ্য চরিত্র রামতারন মুখুজ্জ্যে চায়ের আড্ডায় বেশিরভাগ সময়েই ভূতপ্রেত সম্পর্কে কথা বলে থাকে। তার মতে ভূত ও প্রেত দুটি স্বতন্ত্র জীব। চায়ের আড্ডার মাঝে সে তার বন্ধুদের বলে, মৃত্যুর পর মানুষ যতদিন

না পুনরায় আবার জন্মগ্রহন করে ততদিন প্রেতাবস্তায় থাকে-'ধ্রুবং জন্ম মৃতস্যচ'। আর যারা ভূত তারা চিরকালই ভূত হয়ে থাকে। রামতারনবাবু ভূতেদের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আবার বলে মরা মানুষের আত্মাকে প্রেত বলা হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি ইংরেজি ঘোস্টকেও প্রেত হিসেবে গণ্য করেছেন। অন্যদিকে পিশাচ ও পল্টারগাইস্টকে ভূত বলতে চেয়েছেন। ভূত বলতে অপদেবতা- তারা নাকে কথা বলে, ভয় দেখায়, ঘাড় মটকায়, নানারকম উপদ্রব করে। কিন্তু প্রেত সেরকম নয়, জীবিত অবস্থায় তারা যেমন স্বভাবের হয়ে থাকে প্রেতে পরিণত হলেও সেই রকমই আচরণ করে তারা। উনিশ শতকের শহুরে সমাজে মধ্যবিত্ত মানুষ সেইভাবে ভূতে বিশ্বাস করে না তাই লেখক রামতারনের বক্তব্যে পেশ করেছেন-

> "বাদশাহী আর ব্রিটিশ জমানায় ভূত প্রেতের কথা অনেক শোনা যেত, কিন্তু এখনকার এই সেকিউলার ভারতে তারা ফৌত হয়ে যাচ্ছে।"[১৮]

ভূত যে মধ্যযুগের সমাজে ছিল তার প্রমান দিতে গিয়ে জটাধর বকশী বাদশা জাহাঙ্গীরের আমলে দিল্লিতে যে ভূতের উপদ্রব হয়েছিল তা ভারতচন্দ্র রায়গুনাকরের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য থেকে তিনি দৃষ্টান্ত দেন।

রামতারনবাবু এমন একটি সমাজের প্রতিভূ যারা বন্ধু মহলে ভূত প্রেত নিয়ে গল্পের ফাঁদ পেতে বসে; কিন্তু অন্য কেউ তাকে ভয় দেখাতে চাইলে সে বলে –

> "আমি নিষ্ঠবান ব্রাহ্মণ তোমাদের মতন অখাদ্য খাই না, নিত্য- সন্ধ্যা আহ্নিক করি।ভূতের সাধ্য নেই যে আমার কাছে ঘেঁষে।"[১৯]

তিনি নিজে ভূতে বিশ্বাস করেন না কিন্তু কপিল গুপ্ত তাকে ভয় দেখালে তখন আবার সে হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রের দোহাই দেয়। এই গল্পের ভৌতিক পরিবেশের কথা যার কাছ থেকে শোনা যায় সে

হল কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র জটাধর। এই কাহিনিতে রামতারনবাবু ও জটাধর বকশীর মধ্যে ভূত প্রত্যক্ষ দর্শন করা নিয়ে বাজি হয়। বকশীবাবু ভূত দেখাবেন বলে তৎক্ষণাৎ ১৯৪১ সালের যুদ্ধ সময়কার কাহিনি বলতে শুরু করেন।পটভূমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়কাল। জটাধর গল্পের ফাঁদ বুনতে শুরু করলে রামতারন অধৈর্য্য হয়ে যায়। এই গল্পের শেষে গল্পকার একটা চমক রেখেছেন। যেখানে দেখা যায় জটাধর বকশী নিজেকে মৃত ঘোষনা করছে। রামতারণের জটাধরের কাহিনি অবিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। তাই সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে,

> "...তবে আপনি বেঁচে আছেন কি করে ?
>
> বজ্রগম্ভীর স্বরে জটাধর বকশী বললেন, কে বললে বেঁচে আছি ? আপনার হুকুমে বাঁচতে হবে নাকি?"[২০]

জটাধরের বক্তব্যে চায়ের আড্ডায় সকলে ভীত হয়েছিল। কিন্তু রামতারণবাবু তার কথা বিশ্বাস করতে পারেনি। গল্পটি এই পর্যন্ত পড়লে এটিকে শুধু ভূতের বলেই মনে হবে । জটাধর সিরিজের তিনটি গল্প পড়লে জটাধর সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব। আসলে জটাধর একজনচরিত্র ঠগ্ প্রকৃতির। পরশুরামের রচনার সম্পর্কে বলতে গিয়ে আগেই বলা হয়েছে যে, তিনি শুধুমাত্র ভূতের গল্প লিখতে চাননি । সমাজের থাকা এই জটাধরের মতো চরিত্রদের বিভিন্ন দিক গুলিকে ব্যঙ্গের সঙ্গে বিদ্রূপ করেছেন।

তথ্যপঞ্জি

১) রাজশেখর বসু, "ভূমিকা", *পরশুরাম গল্পসমগ্র,*দীপঙ্কর বসু (সম্পা), কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, অক্টোবর ২০১০, পৃ. ২৪-২৫।

২) রাজশেখর বসু, "ভুশন্ডীর মাঠে", *পরশুরাম গল্পসমগ্র,*দীপঙ্কর বসু (সম্পা), কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, অক্টোবর ২০১০, পৃ. ৯২-৯৩।

৩) তদেব, পৃ. ৯২- ৯৩।

৪) তদেব, পৃ. ৯৩।

৫ তদেব, পৃ. ৯৪।

৬) তদেব, পৃ. ৯৪।

৭) তদেব, পৃ. ৯৬।

৮) তদেব, পৃ. ৯৮।

৯) তদেব, পৃ. ১০০।

১০) তদেব, পৃ. ১০০।

১১) তদেব, পৃ. ১০০

১২) রাজশেখর বসু, "মহেশের মহাযাত্রা", *পরশুরাম গল্পসমগ্র,*দীপঙ্কর বসু (সম্পা), কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, অক্টোবর ২০১০, পৃ. ২১৭।

১৩) তদেব, পৃ. ২১৯।

১৪) তদেব, পৃ. ২১৯।

১৫) তদেব, পৃ. ২২৩।

১৬) রাজশেখর বসু, "বদন চৌধুরীর শোকসভা", *পরশুরাম গল্পসমগ্র,*দীপঙ্কর বসু (সম্পা), কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, অক্টোবর ২০১০, পৃ. ৩৯৩।

১৭) তদেব, পৃ. ৩৯৪।

১৮) রাজশেখর বসু, "জটাধর বকশী", *পরশুরাম গল্পসমগ্র,*দীপঙ্কর বসু (সম্পা), কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, অক্টোবর ২০১০, পৃ. ৪৩৮।

১৯) তদেব, পৃ. ৪৩৯।

২০) তদেব, পৃ. ৪৪১।

চতুর্থ অধ্যায়

ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরামের সৃষ্ট ভূতেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

বাংলায় যে সমস্ত ভূত প্রচলিত আছে সেই ভূতেদের কিছু আচার-ব্যবহার ত্রৈলোক্যনাথের রচনায় লক্ষ্য করা যায়। ভূত সমাজেরও যে আদব-কায়দা রীতি নীতি থাকতে পারে তা ভূতেরই কণ্ঠে প্রকাশ পেয়েছে। 'বীরবালা' গল্পে দুই প্রকারের ভূতের উপস্থিতি লক্ষ্য করার মতো।

- সবুজ ভূত-

'বীরবালা' গল্পে একদিকে পৃথিবীর প্রান্তে থাকা সবুজ ভূতেরা বীরবালাকে হত্যা করে তাকে কেটে পিঠে প্রস্তুত করতে চায়। সবুজ বুড়ি বৃদ্ধা ভূত সাধারণ মানুষের মতো গাছতলায় বসে রৌদ্র পোহায় ও চরকা কাটে। ভূতেদের সমাজেও পৌষ পার্বণ-এর মতো সামাজিক অনুষ্ঠান হয় তার ধারণা এখানে পাওয়া যায়। পৌষ পার্বণে বাঙালি সমাজ যেভাবে অনুষ্ঠান নিয়ে প্রস্তুতি নেয় ভূতেদের সমাজেও অবিকল একই আচার রয়েছে; তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল-

> "চারিদিকে চাউল কুটিবার ধুম পড়িয়া গেল। ডালবাটা হইতে লাগিল। অবশেষে বীরবালাকে কুটিবার সময় উপস্থিত হইল।"[১]

অন্য ভূত সমাজের ভূতেরা আচারনিষ্ঠ নয় কিন্তু এই সবুজ ভূতেরা ভূতুড়ে সমাজের আদব কায়দা পালন করে চলে তা ভূতেদেরই কণ্ঠে গল্পে প্রকাশ পেয়েছে।

- খর্বকায়ভূত-

পৃথিবীরপ্রান্তে একেবারে শেষে এই ভূতেদের বাস। এরা পৃথিবীর প্রাচীর দ্বার ভাঙ্গার জন্য সর্বদা চেষ্টা করে। তাদের উদ্দেশ্য প্রাচীর ভেঙ্গে পৃথিবীতে প্রবেশ করা ও পৃথিবীকে ভূতের রাজ্যে পরিণত করা। খর্বকায় সবুজ ভূতেরা মানুষের ক্ষতি করতে চায়; এরা বীরবালার কবজ ছিঁড়ে ফেলে তার অনিষ্ট সাধন করতে চেয়েছিল।

- সাহেব ভূত-

এই ভূতটির বাসস্থান ভূমধ্যসাগরের তীরে। বীরবালা জোরে দীর্ঘশ্বাসের ফলে সাহেব ভূতের শরীরের সব হাড় জোড় খুলে যায়। অতঃপর বীরবালা কাদা দিয়ে সাহেব ভূতের হাড় জোড়া দেয়। এই সাহেব ভূতই বীরবালাকে টেলিগ্রাফের সাহায্যে বিলেতে যাবার ব্যবস্থা করে দেয়-

> "সাহেব ভূত কহিলেন- ...তোমাকে টেলিগ্রাফে বিলাত পাঠাইয়া দিতেছি।... এই বলিয়া সাহেব- ভূত সমুদ্রের বালি দিয়া বড় একটি টেলিগ্রাফের তার প্রস্তুত করিলেন।"[২]

'লুল্লু' গল্পে ত্রৈলোক্যনাথ প্রাসাদের ছাদে থাকা ভূত, গাছে থাকা ভূত, মাঠের মাঝখানে পুরনো কুয়োতে থাকা ভূত ও হিমালয়ের পাদদেশে থাকা ভূতের বর্ণনা দিয়েছেন।

- লুল্লু ভূত-

লুল্লু একটি সভ্যভব্যনব্য ভূত। দুখিরাম চন্ডালের মৃত্যুর পর তার হয়ে ভূতগিরি করে থাকে। নিবাস শেখ আমিরের প্রাসাদের সামনের একটি গাছে। আমিরের বেগমকে নিয়ে পালিয়েছিল এবং তাকে বিবাহ করার বাসনা ছিল ।আমীরের স্ত্রীকে বারবার বিবাহের প্রস্তাব দিলেও সে

তার মন জয় করতে পারিনি। শেষে রেগে গিয়ে লুল্লু ভয় দেখিয়ে তার ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। লুল্লুর বিকট মূর্তির রূপটি আমীরের স্ত্রীর বর্ণনায় এইরূপ-

> "...একদিন কিন্তু সে ভয়ানক রাগিয়া গেল। শরীর ফুলিয়া দ্বিগুণ হইল, ভূত না হইলে হয়তো ফাটিয়া মরিয়া যাইত। সমুদয় শরীর হইতে অগ্নিকণা বাহির হইতে লাগিল। পা দুইটা খুলিয়া লইল আর সেই রূপ ঘুরাইল। দুইটি হাত, দুইটি পা ঘুরান হইলে চক্ষু-কোটর হইতে চক্ষু দুইটি বাহির করিয়া লইল, আর যেরূপ লোকে ভাঁটা লুফিয়া থাকে, সেইরূপ দিউ হাতে লুফিতে লাগিল। তারপর সমস্ত মুণ্ডটি খুলিয়া লইল, হাতে লইয়া বলিল, সুন্দরি! যদি তুমি আমাকে বিবাহ না কর, তাহা হইলে তোমার সাক্ষাতে আমি এই আপনার মুণ্ডটি আপনি চিবাইয়া খাইব।"[৩]

কিন্তু আমির ও তার স্ত্রীর ষড়যন্ত্রে লুল্লু শেষ পর্যন্ত এমনই চণ্ডুর নেশায় পড়ল যে বাকি জীবন শুধু দুইবেলা খানিক চণ্ডুর বিনিময়ে আমিরের সেবা করে জীবন কাটে। ঘ্যাঁঘোঁ ভূত ও নাকেশ্বরীর বিবাহ উপলক্ষে আমীর সারা বিশ্বের ভূতকে নিমন্ত্রিত করার জন্য লুল্লুকে আদেশ করে। কিন্তু প্রত্যত্তুরে জানায়-

> "...আমরা ভারতীয় ভূত, ভারতের বাহিরে আমরা যাইতে পারি না। সমুদ্রের ওপর পারে পদক্ষেপ করিলে আমরা জাতিকুল-ভ্রষ্ট হইব। আমাদের ধর্ম কিঞ্চিত কাঁচা।"[৪]

ভূত হয়েও তারা ভারতীয় কুসংস্কার ত্যাগ করতে পারেনি। লুল্লু হল অন্ধ-কুসংস্কারে বিশ্বাসী ভারতীয়দের টাইপ চরিত্র।

- গেছো ভূত-

এই ভূতটি গরীব ব্রাহ্মণের দুঃখের কথা শুনে মহাজনের কন্যার দেহে প্রবেশকরে তাকে সাহায্য করে। ভূতটি ব্রাহ্মনকে আদেশ দেয় যে,-

"...তা তোর ভাবনা নাই, তুই বাড়ী ফিরিয়া যা। তোদের গ্রামের মহাজনের কন্যাকে আমি গিয়া পাইব। কিছুতেই ছাড়িব না, কেবল তুই গিয়া যখন আমার কানে কানে বলবি যে, আমি সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়াছি, তখনই আমি ছাড়িয়া দিব। মহাজনের অনেক টাকা আছে...অনেক ধন দৌলত দিয়া তোকে বিদায় করিবে, তোর দুঃখ ঘুচিবে।"[৫]

ভূতেদের সমাজেও যে বেকার সমস্যা রয়েছে তা এই গেছো ভূতের থেকে জানতে পেরেছে আমীর ও ব্রাহ্মণ।

- ঘ্যাঁঘোঁভূত-

নিবাস বিশাল এক মাঠের মাঝখানে একটি পুরনো পাতকুয়োর ভেতর। সব ভূতেদের সমস্ত খবর সে রাখে। ভূতদের গেজেট অফিসার নামেও ঘ্যাঁঘোঁ পরিচিত। চেহারা বেঁটে খাটো বয়সে বৃদ্ধ। তবে ভূত জীবনে বেঁচে থাকার একটিই লক্ষ্য তার ; তা হল পূর্ণ যৌবনী ভূতকামিনী নাকেশ্বরীকে বিবাহ করা।

- গোঁগোঁ ভূত-

এই ভূতটি মাঠের প্রান্তে একটি আমগাছে গলায়-দড়ি গোঁগোঁ ভূত থাকে। বাংলায় যে সমস্ত ভূতের ভাবনা বা নাম প্রচলিত আছে তাদের মধ্যে গোঁগোঁ ভূত 'গেছোভূতে'র শ্রেণীতে পড়ে। গ্রামের কেউ আত্মহত্যা করতে মনস্থির করলে সেই গাছে গিয়ে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে। তাড়াতাড়ি কেউ প্রাণ ত্যাগ না করলে গোঁগোঁ তখন তাদের পা ধরে ঝুলে পড়ে; আর এই কাজে প্রলোভন দেখায় গোঁগোঁ ভূত। এই গোঁগোঁ ভূতকে আমীর প্রলোভন দেখিয়ে পত্রিকার সম্পাদক করার প্রতিশ্রুতি দেয়। আমীর তার স্ত্রীকে উদ্ধার করার জন্য এই গোঁগোঁ ভূতের

তেল বের করে।তেল বার করার পর গোঁগোঁ ভূতের চেহারার যে বর্ণনা গল্পকার দিয়েছেন তা কৌতুকের রসে পূর্ণ,-

> "ভূতের দেহ একেবারে তেলশুন্য শুষ্ক হইয়া গেল, তখন বলদ থামিল, ঘানিগাছ আর ঘুরিল না। আমীর সেই ছোবড়ারূপা ভূতকে বাহির করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।"[৬]

সে তার স্ত্রীকে উদ্ধারকল্পে সফল হলে গোঁগোঁ ভূতকে তার বাড়িতে আশ্রয় দেয়; শেষে তাকে একটি পত্রিকার সম্পাদক ও করেন।

- চীনে ভূত-

'পিঠে পার্ব্বণে চীনে ভূত' গল্পে যে চীনে ভূতের উল্লেখ করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ তা ভারতীয় ভূত নয়। তার মৃত্যু হাত কাটা অবস্থায় হয়েছিল; কিন্তু মরে গিয়েও সে তার হাতের মায়া ভুলতে পারেনি। তাই প্রতি রাতেই চীনে ভূত যে ডাক্তার তার হাত কেটে কাঁচের শিশিতে সংরক্ষিত করেছিল তার বাড়ি হানা দেয়। এই চীনে ভূতের চেহারার যে বর্ণনা দেন লেখক তা খুব রোমাঞ্চকর,-

> "...কিছু নিকটবর্তী হইলে রাধামাধব দেখিলে, ভূতটির মাথা নেড়া। আরও একটু নিকটে আসিলে তিনি দেখিলেন যে, তাহার পশ্চাৎ দিকে লম্বা বেণী ঝুলিতেছে। বেনুনী দেখিয়া রাধামাধব ভাবিলেন জে,- "এঃ! এটা দেশী ভূত নহে, চীনে ভূত।"[৭]

চীনে ভূতকে ঠকানোর জন্য রাধামাধব একরাতে একটি কাঁচের শিশিতে হাসপাতাল থেকে আনা একটি কাটা হাত রাখে। যা দেখে ভূতের মনে যে প্রতিক্রিয়া ঘটে তা তুলনীয়-

"...যে শিশির ভিতর রাধামাধব সেই হাতটি রাখিয়াছিলেন, ভূত আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। শিশির ভিতর হাত দেখিয়া আনন্দে তাহার মুখ প্রফুল্ল হইল। শিশিটি সে বাম হাতে তুলিয়া মনোযোগপূর্ব্বক দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষন দেখিয়া রাগে তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইল। রাগে সে শিশি দূরে ভূমির উপর নিক্ষেপ করিল। শিশিটি ভাঙ্গিয়া গেল। ভূত অদৃশ্য হইল।"[৮]

কাহিনিতে রাধামাধবের মামা যখন চীনে ভূতের ভাঙ্গা হাত ফিরিয়ে দেয় সে রাতে খুশিতে ভূত নাচ ও গান করে। এবং একটি ঘরে কিছু খাবার রাখা ছিল ভূত তা খায়,-

"অবশেষে শিশিটি হাতে লইয়া আনন্দে সে ঘরের ভিতর দুপ দাপ, ধুপ ধাপ নৃত্য করিতে লাগি। নাচিতে নাচিতে গান গাহিতে গাহিতে শিশিটা হাতে করিয়া ঘর হইতে সে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। ...ঘরের মাঝখানে বসিয়া চীনে ভূত- থালা ও অনেকগুলি বাটি হইতে কি সব আহার করিতেছে।"[৯]

- অশরীরী ভূত-

মৃত রামমণি ছোটো ফুলের মতো মৃত মেয়ে সেই অভিশপ্ত বাড়িতে বসবাসকারী যেকোনো মেয়েকে খেলা করতে ডাকে করুণ অনুনয় করে। এই ছোটো মেয়ে ভূত কে প্রথমে শুধু সীতায় দেখতে পেত। সীতা শামীমাসিকে ওই মেয়ে সম্পর্কে বলে যে,-

" মেয়েটি আমার মতো বড়, কিন্তু খুব সুন্দর। উপর দিকে আমার পানে চাহিয়া। সে বলিল,- সীতা! নেমে আয় না ভাই, আমরা দুইজনে খেলা করি।"[১০]

এর মধ্যে এমন একটা কারণ্য ও মানবিকতার আবেদন আছে যা পাঠক হৃদয়কে স্পর্শ করে। শামিমাসি নামে যে চরিত্র গল্পে বর্ণিত হয়েছে সে প্রায়ই বাইরের ভাঙ্গা বাড়ী থেকে বেহালার গান শুনতে পায়। কোনও মেঘ বা বৃষ্টির দিনে এই সব আচরণ বেশি শোনা যায়। আসলে

জগমোহন চৌধুরী মৃত্যুর পরও তার গান বাজনার সৌখিনতা ত্যাগ করতে পারিনি। সে এই বেহালা বাজায়। জগমোহনদের ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ স্মৃতিভাস্যে গল্পকার দেখিয়েছেন,-

> "একবার নয়, আরও অনেকবার আমি সেই বেহালার শব্দ শুনিতে পাইলাম। যখনই রাত্রিকালে বাদলা ও দুর্য্যোগ হয়, তখনই বাহির-বাড়ীতে কে যেন প্রাণপণে বেহালা বাজায়। কেবল বেহালা নহে, সে বৎসর পূজার সময় মহাষ্ঠমীর রাত্রিতে বাহির-বাড়িতে আমি শাঁকঘণ্টার শব্দও শুনিয়াছিলাম, ধূপ-ধূনার গন্ধও পাইয়াছিলাম। বলিদানের সময় যেমন এক ভক্ত বিকট স্বরে মা মা বলিয়া চীৎকার করে, সে শব্দও শুনিয়াছিলাম।"[১১]

এখানে ভয়ের সঙ্গে কারুণ্য, সমবেদনার সঙ্গে মানব সঙ্গ ব্যাকুলতা মিশেছে।এই গল্পের অন্তর্নিহিত কারুণ্য পাঠক মনে অভিভূত করে।

'ভুশন্ডীর মাঠে' গল্পে লেখক রাজশেখর বসু বাঙালির জীবনের পটচিত্র অঙ্কন করেছেন। এখানে তিনি যেসব ভূতের আগমন ঘটিয়েছেন তারা হলেন- শিবু ভূত, কারিয়া পিরেত, যক্ষ, পেত্নী, শাঁকচুন্নি, ডাকিনী।

- শিবু ব্রহ্মদৈত্য-

বয়স বত্রিশ। নিবাস ছিল পেনেটি গ্রামে সে স্ত্রী নৃত্যকালীর সঙ্গে ঝগড়া করে কলকাতা পালিয়া যায়। একদিন খাওয়ার গোলমালে মাত্র আটঘন্টা রোগে ভুগে মারা যায়। ব্রহ্মদৈত্য হয়ে সে ভুশন্ডীর মাঠের একটা বেল গাছে আশ্রয় নেয়। এখানেই তার কারিয়া পিরত ও যক্ষ নাদু মল্লিকের সঙ্গে তার আলাপ হয়।শিবুর যদিও রক্ত মাংসের শরীর নেই, তবু মাঠের আসে পাশে এক পেত্নী, এক শাঁকচুন্নি এবং এক ডাকিনী কে দেখে মনটা খাঁ খাঁ করে।

- কারিয়া পিরেত-

ভুশন্ডীর মাঠের কেলে ভূত। মাথায় পাগড়ি, কাল লিকলিকে চেহারা, কাঁকলাসের মত একটি জীবাত্মা। বাড়ি ছিল ছাপড়া জিলা। স্ত্রী মুংরীর সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে চাঁপ দানির মিলে কাজ করে ও সেখানে কর্মরত অবস্থায় মাথায় আঘাত লেগে তার মৃত্যু হয়। সম্প্রতি সে ভূত হয়ে ভূশন্ডীর মাঠে তালগাছে বিরাজ করে আর মনের আনন্দে গান করে। তার গান করার একটি দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া হল-

"চা রা রা রা রা রা
আরে ভজুয়াকে বহিনিয়া ভগ্‌লুকে বিটিয়া
কেক্‌রাসে সাদিয়া হো কেক্‌রাসে হো-ও-ও-ও-"[১২]

ভূতেদের সমাজেও একজন ভূত তার গুরুজন বা ব্রাহ্মণকে প্রণাম জানায় তার কথা এই গল্পে বলা হয়েছে,-

"...কাঁকলাসের মত একটি জীবাত্মা সড়াক করিয়া তালগাছের মাথা হইতে নামিয়া ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল- গোড় লাগি বরমদেওজী।"[১৩]

একে ওপরের পরিচয় পেয়ে যখন শিবু নৃত্যকালী, পেত্নী, ডাকিনীর তুমুল ঝগড়া শুরু হয় তখন ডাকিনী মন্ত্র করে দ্বার রুদ্ধ করে রাখে। এই রুদ্ধ দ্বার উৎপাটন এর জন্য কারিয়া পিরেতমন্ত্র প্রয়োগ করে-

"মারে জ্ জুয়ান- হেঁইয়া
আউর ভি থোড়া- হেঁইয়া

পর্বত তোড়ি-হেঁইয়া

চলে ইঞ্জন-হেঁইয়া

ফটে বয়লট-হেঁইয়া

খবরদার- হা-ফিজ।”[১৪]

- যক্ষ-

‘ভুশন্ডীর মাঠে’ গল্পে এই যক্ষ হলেন নদেরচাঁদ মল্লিক। তার চেহার রূপ এই রকম-

“স্থূল খর্ব দেহ, থেলো হুঁকার খোলের উপর একজোড়া পাকা গোঁপ গজাইলে যে রকম হয় সেই প্রকার মুখ, মাথায় টাক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে ঘুণ্টি দেওয়া মেরাজাই, পরনে ধুতি পায়ে তালতলার চটি।”[১৫]

‘ভুশন্ডীর মাঠে’ গল্পে শিবু ভূত, কারিয়া পিরেত, যক্ষ যখন জানতে পারে তাদের পরিবারে সকলেরই একই অবস্থা তাই দুঃখ লাঘবের জন্য তারা সংগীত চর্চায় মনোনিবেশ করে। যক্ষের সঙ্গীত চর্চার দৃষ্টান্ত দেখান হল-

“ধা ধা ধিন তা কৎ তা গে, গিন্নী ঘা দেন কর্তাকে

ধরে তাড়া ক’রে খিটখিটে কথা কয়

ধূর্তা গিন্নী কর্তা গাধারে।

ঘারে ধ’রে ঘন ঘন ঘা কত ধূম্ ধূম্ দিতে থাকে।

টুঁপি টিপে ঝুঁটি ধরে উলটে পালটে ফ্যালে

গিন্নী ঘুঘুটির ক্ষমতা কম নয়;

ধাককা ধুককি দিতে ত্রুটি ধনী করে না

নগণ্য নির্ধন কর্তা গাধা-

‘ধা’-এর উপর সম। ধিন্ তা তেরে কেটে গদি ঘেনে ধা।”[১৬]

ভূতেদের এই সঙ্গীত চর্চার বিষয়টি খুবই আকর্ষণীয় এ রকম দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে খুবই বিরল।

- পেত্নী-

ভুশন্ডীর মাঠের শেষে পিটুলি বিলের ধারে শ্যাওড়া গাছে বাস করে এবং সন্ধ্যা বেলা পলো হাতে মাছ ধরে। তার আপদ মস্তক ঘেরাটোপ দিয়ে ঢাকা। একবার সে ঢাকা খুলে শিবুর দিকে চেয়েছিল ও লজ্জায় জিব কেটেছিল।

- ডাকিনী-

শিবুর ভূতের মন সবচেয়ে বেশি হরণ করে এই ডাকিনী। এখানে বলা দরকার নৃত্যকালী মৃত্যুর পর ডাকিনীর রূপ ধারণ করে। ভুশন্ডীর মাঠের পূর্বদিকে গঙ্গার ধারে ক্ষীরী-বামনীর পরিত্যক্ত ভিটায় ভাঙ্গা বাড়িতে সে আশ্রয় নেয়। ডাকিনীকে শিবু একদিন দূর থেকে একপলকের জন্য দেখেই মজে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে এই ডাকিনীকে খেজুরের ডাল দিয়ে তার বাড়ির উঠোন ঝাড় দিতে দেখা যায়। শিবু ডাকিনীর রূপ বর্ণনা করতে বলেছে-

> "কি দাঁত! কি মুখ! কি রং! নৃত্য কালীর রঙ্গ ছিল পানতুয়ার মতো। কিন্তু ডাকিনীর রং যেন পানতুয়ার শাঁস।"[১৭]

- বদন চৌধুরীর ভূত-

মৃত্যুর পর বদন চৌধুরী নরকের ‘গ’ বিভাগে স্থান পেয়েছে। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট যে স্মরণ সভার আয়োজন হয় সেখানে যাবার জন্য সে যমরাজের ছুটি নেয়। শোকসভায় ঘনশ্যাম ঘোষালের প্রেত সভাপতি গোবর্ধন মিত্রের ভেতরে প্রবেশ করে বদন চৌধুরীর রাজনৈতিক কেচ্ছাগুলি একে একে সভার সামনে প্রকাশ করে। এর প্রতিশোধ নেবার জন্য বদন চৌধুরী আঙ্গিরস গাঙ্গুলির শরিরে ভর করে ঘনশ্যাম ঘোষালের জুয়াচুরিকে প্রকাশ করে। ভূত হয়েও তারা মর্ত্যে এসে তাদের মধ্যে মানুষের মতো প্রতিশোধ স্পৃহার ভাব লক্ষ্য করা যায়।

ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরাম তাঁদের গল্পে যেসব ভূতেদের গল্পে ব্যবহার করেছেন, তারা মানুষেরই আচার আচরণ করে । ত্রৈলোক্যনাথের হাত ধরে এই সমস্ত আধুনিক ভূতের সাহিত্যে আগমন হয়েছে । তার পর পরশুরামের গল্পেও তা পরিপূর্ণতা পায় ।

তথ্যপঞ্জি

১) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, "বীরবালা",*ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী,* সুদেব মুখোপাধ্যায় (সম্পা), কলকাতা: কামিনী প্রকাশালয়, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ. ৫৭৮।

২) তদেব, পৃ. ৫৮১।

৩) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, "লুল্লু", *ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী,* সুদেব মুখোপাধ্যায় (সম্পা), কলকাতা: কামিনী প্রকাশালয়, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ. ২৬।

৪) তদেব, পৃ. ৩২।

৫) তদেব, পৃ. ১৫।

৬) তদেব, পৃ. ২৩।

৭) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, "পিঠে পার্ব্বণে চীনে ভূত", *ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী,* সুদেব মুখোপাধ্যায় (সম্পা), কলকাতা: কামিনী প্রকাশালয়, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ. ১৬৪।

৮) তদেব, পৃ.১৬৯।

৯)তদেব, পৃ. ১৭০।

১০) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, "পূজার ভূত", *ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী,* সুদেব মুখোপাধ্যায় (সম্পা), কলকাতা: কামিনী প্রকাশালয়, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ. ৬১৯।

১১)তদেব, পৃ. ৬১৭।

১২) রাজশেখর বসু, "ভুশন্ডীর মাঠে", *পরশুরাম গল্পসমগ্র,* দীপঙ্কর বসু (সম্পা), কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, অক্টোবর ২০১০, পৃ. ৯৫।

১৩)তদেব, পৃ. ৯৫-৯৬।

১৪)তদেব, পৃ. ৯৯।

১৫)তদেব, পৃ. ৯৬।

১৬)তদেব, পৃ. ৯৮।

১৭)তদেব, পৃ. ৯৪।

উপসংহার

ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরামের গল্পের ভূতের পরম্পরা কথাটির অর্থ ধারাবাহিকতা। তাই বলা যায় ত্রৈলোক্য সৃষ্ট ভৌতিক গল্পের ধারাটিকে পরশুরাম অনেকাংশে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। অর্থাৎ পরশুরাম ও ত্রৈলোক্যনাথকে একে ওপরের দোসর বলতে কোনও দ্বিধা নেই। কিন্তু পরশুরাম যেখানে বাংলা সাহিত্যের বা সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে বহুচর্চিত একজন লেখক। সেখানে ত্রৈলোক্যনাথে প্রচারের আলো অনেকাংশে নির্বাসিত। এমনকি বর্তমানেও তিনি তাঁর পাওয়া সম্মান থেকে বঞ্চিত। তার কারণ হল তাঁর গল্পের উপাদান, যা পাঠক এবং সমালোচক উভয়কেই বিভ্রান্ত করে এবং সে উপাদান তাঁর গল্পের সঠিক নির্ণয় নিতে বাধার সৃষ্টি করে। পরশুরাম ভূতের গল্পে যেখানে সমাজকে তিরস্কার করেছেন তা পাঠক বা সমালোচক কারোরই বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের চরিত্র এবং উপাদানগুলি এমনই কুহেলিকাময় যে সে গুলিকে সমাজ সচেতন একজন লেখকের রচিত সাহিত্য বলে বুঝতে অনেকের অসুবিধা হয়। অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতারা শিশু কিশোর সাহিত্যের ধারায় ত্রৈলোক্যনাথকে জায়গা দেওয়ার পরিপন্থী। ত্রৈলোক্যনাথের সমসাময়িক কালের পটভূমিকে তাঁর গল্পগুলির সঙ্গে মিলিয়ে না পড়লে তাঁর সাহিত্যধারা বোঝা সম্ভব নয়। পরশুরামের মতো তিনি নিজের গল্পের ভৌতিক চরিত্র কেন্দ্রিক ব্যঙ্গগুলিকে তীব্র করেননি। কারণ তিনি এই সকল উপাদানগুলিকে বেছে নিয়েছিলেন সমাজের নানা সমস্যা গুলিকে প্রমাণ করার জন্য। একমাত্র সুকুমার সেন রচিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-এ ত্রৈলোক্যনাথের স্থান রয়েছে তবে 'ক্রাইমকাহিনি' সাহিত্যক হিসাবে। তবে শিশুকিশোর সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর রচিত সাহিত্যের বিস্তর পার্থক্য বর্তমান রয়েছে। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী যিনি শিশু সাহিত্যের অন্যতম রূপকার। শিশু সাহিত্যের সকল বৈশিষ্ট্য তাতে বিদ্যমান। কিন্তু সেই

তুলনায় ত্রৈলোক্য সাহিত্যে এই সকল বৈশিষ্ট্য ব্যতীত। সমাজ রয়েছ, সমাজ সচেতনতা রয়েছে যা তাকে ব্যতিক্রম করে তুলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে দাঁড়িয়ে অন্যান্য লেখকেরা যেমন বঙ্কিম সাহিত্যের অনুসারী সেখানে ত্রৈলোক্যনাথ নিজস্ব একটি পথ তৈরি করলেন যা বঙ্কিমচন্দ্রের থেকে একেবারে আলাদা। নিজের মহিমায় নিজে উজ্জ্বল। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণের অভাবে তাঁর গল্পগুলি যথোচিত মর্যাদা কোনোদিনও পায়নি তাইতো সুকুমার সেনের মতো সাহিত্যের ইতিহাস কারেরাও তাঁর গল্পের মধ্যে উপস্থিত যে সমাজ সচেতনতা তাকে স্বীকার করতে নারাজ ছিলেন। তাই তাকে ঠেলে দেওয়া হল অন্ধকারময় অতলতায়।

কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের ‘কঙ্কাবতী’, ‘ভূত ও মানুষ’, ‘ডমরুচরিত’প্রভৃতি বই গুলি পাঠ করলে নিঃসংশয়ে বাংলাসাহিত্যে এক সম্পূর্ণ নূতন দিকের সন্ধান পাওয়া যায় তা বলাই বাহুল্য। বাংলা সাহিত্যে এমন আজগুবি ও ভূতের গল্প আর কী কেউ রচনা করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। ত্রৈলোক্যনাথের রচনার বিশেষত্ব এখানেই যে তা সরস তবুও তা নির্দোষ। ত্রৈলোক্যনাথের আগে কল্পনাতীত রচনার বৈশিষ্ট্যর দিক থেকে ত্রৈলোক্যনাথের স্থান পরশুরামের ঊর্ধ্বে।

পরশুরামের গল্পেও ভূতেদের রীতিনীতি, পার্বণ, অনুষ্ঠান, আচরণ সবই যেন বাঙালি শহুরে সমাজের চিত্র। এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে সমাজের চিত্রগুলিকে পরশুরাম খুবই পরিষ্কার বা স্পষ্টভাবে এঁকেছেন। সেখানে ত্রৈলোক্যনাথে কিছুটা প্রচ্ছন্নতা দেখা যায়। পরশুরামের প্রায় গল্পেই দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রথমে ভূতে বিশ্বাস করছে না এই অবিশ্বাস শহুরে রীতিনীতির বৈশিষ্ট্য । কিন্তু অন্তিমে এমন কিছু পরিবেশ বা পরিস্থিতি তৈরি করেছেন যার ফলে

কেন্দ্রীয় চরিত্র ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়ে এমন সুন্দরভাবে পাঠকের মনোযোগ ধরে রাখা পরশুরামের গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য । ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরামের গল্পের ভূতেরা মধ্যবিত্ত গ্রামীণ ও শহুরে বাঙালির সমাজের প্রতিভূ তা তাদের সংলাপ শুনলেই সংশয় জাগে পাঠকের মনে যে তারা আসলে ভূত কিনা।

ত্রৈলোক্যনাথের ভৌতিক গল্পগুলির পটভূমি গ্রাম বাংলার সমাজ এবং সমাজ কেন্দ্রিক নানা সমস্যার সমস্যার চিত্র গুলিকে স্পষ্টভাবে তিনি এঁকেছেন। আলোচনার বিষয় ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরামের তুলনা নয়। ভূতেরা তাঁদের গল্পে কীভাবে এসেছে সেটিই মূল অনুসন্ধানের বিষয়। ত্রৈলোক্যনাথ ভূতের গল্পের রসদ নিয়েছেন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চন থেকে। অন্যদিকে পরশুরাম শহরের পরিবেশকে তাঁর ভৌতিক গল্পগুলির উপকরণ হিসেবে বেছেছেন। তাই পরশুরাম ও ত্রৈলোক্যনাথকে একে ওপরের পরিপূরক বলতে কোনও দ্বিধা থাকতে পারে না। দুজন লেখকের গল্পগুলির মাধ্যমে পাঠক গ্রাম ও শহর দুটির সঙ্গেই পরিচিত হতে পেরেছেন।

ত্রৈলোক্যনাথের পরে অনেকেই ভূতের গল্প লিখেছেন। কিন্তু এই ধারায় তাঁদের আনা যায় না। তাঁর কারণ তাঁরা বেশির ভাগই ভিন্ন পথের অনুসারী। কিন্তু পরশুরামকে ধারা থেকে বাদ দিয়ে আলোচনা সম্ভব নয় কারণ তিনি ত্রৈলোক্যনাথের ভূতের গল্পগুলির যে মাত্রা তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং সমৃদ্ধ করেছেন।

ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরামের পূর্বে থেকেই সাহিত্যে ভূতের আবতারনা হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথের পূর্বে নানা লেখায় ভূতের প্রসঙ্গ এলেও ছোটগল্পের বা কথা সাহিত্যের ধারায় তিনি ভূতের স্থানকে সমৃদ্ধির উচ্চশিখরে পৌঁছে দিয়েছেন একক প্রয়াসে। ত্রৈলোক্যনাথের দ্বারা অনুপ্রানিত হয়ে তাঁর সমসময়ে এবং পরবর্তীকালে অনেকজন লেখক যেমন- গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী, দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ভূতের গল্প লিখেছেন কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের তুলনায় তা সামান্য। তাঁদের লেখায় ভূত শুধু ভৌতিক সমাবেশ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। গ্রাম বাংলার লোক সাহিত্যের যে ধারা তা ত্রৈলোক্যনাথের ভূতের গল্পের ঐশ্বর্যকে বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু তাঁর গল্পের মূল বিষয় লোকগল্পগুলির প্রচার নয় সমাজের সমস্যা গুলিকে ভূতের রূপকের আড়ালে তিনি প্রকাশ করে গেছেন।

অন্যদিকে পরশুরাম তীব্র স্যাটায়ারের মাধ্যমে তাঁর গল্প গুলিকে করে তুললেন ইঙ্গিতধর্মী। তাঁর অন্যান্য গল্পগুলির মতো ভূতের গল্প গুলিতেও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ উপস্থিত। ত্রৈলোক্যনাথের ভূতের গল্পে ছিল কেবল রূপকধর্মীতা কিন্তু পরশুরাম তাঁর গল্পে আনলেন রূপকের মাধ্যমে ব্যঙ্গ-কটাক্ষ। এখন প্রশ্ন হল কেন ভূতের গল্পের পরম্পরায় শুধুমাত্র ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরামকে বেছে নেওয়া হল তাঁর কারণ দুজনে একটি বৃত্তে অর্ধেক অর্ধেক অংশ। ত্রৈলোক্যনাথ যেখানে গ্রামবাংলার সামাজিক চিত্র এনেছেন তেমনি অন্যদিকে পরশুরাম নগর সমাজকে তাঁর গল্পের মুখ্য বিষয় করলেন। তাঁর ফলে আমরা নগর ও গ্রাম নিয়ে সম্পূর্ণ সমাজের একটি সম্পূর্ণ চিত্র পাই। পরশুরাম ত্রৈলোক্যনাথের ভূতের গল্পের পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ত্রৈলোক্যনাথ বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের যুগে যে নূতন অভিনব একটি নিজস্ব ধারা তৈরি করলেন কিন্তু কেন আর সেই ধারায় কেউ তাঁর উত্তরসূরি হননি তা প্রশ্ন জাগতে

পারে ? উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রোমান্স ও কল্পনাধর্মী উপন্যাস লিখছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাঙালি সমাজ তখন বাস্তব জগত থেকে সরে গিয়ে সেই সব লেখার রসাস্বাদন করছে। উনিশ শতকের সময়কালকে সাহিত্য রচনার ধারায় যদি ভাগ করা যায় তাহলে সেখানে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের লেখা পাওয়া যায়। যেমন- আখ্যান, প্রহসন, রম্যরচনা, কাব্য-কবিতা, রোমান্সধর্মী নভেল বা উপন্যাস। এই শতকের শেষ ভাগটি পুরোপুরি বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ ও রবীন্দ্র যুগের প্রথম পর্যায়। সেখান থেকে বাংলা সাহিত্যে সার্থক উপন্যাসের (দুর্গেশনন্দিনী) পথ চলা। এই সময়কাল পর্বে যাঁরা লিখছেন সকলেই প্রায় বঙ্কিম অনুসারী রচনাকার। এই সময়ে বঙ্কিম তাঁর লেখা প্রবন্ধ 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন'-এ তিনি স্পষ্ট করে নির্দেশ দিয়েছেন সাহিত্য লেখার মাপকাঠি কেমন হওয়া উচিত এবং পরবর্তী সাহিত্যকদের সাহিত্য রচনার সময় কী কী বিষয় মাথায় রাখতে হবে। তাই তাঁর সমসাময়িক লেখক বঙ্কিমের দেখানো পথে অগ্রসর হলেন । তাকেই তারা আদর্শ করে চললেন। কেননা সেই সময়ে বঙ্কিম-এর লেখার বাইরে আর কোন নতুন মডেল বাংলা সাহিত্যে ছিল না বা বলা বাহুল্য যে, কেউই আর বঙ্কিমের দেখানো আদর্শ থেকে বেরিয়ে আসার সাহস দেখালেন না। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য দান করেছেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথও তাঁর প্রথম দিকের লেখায় বঙ্কিমকে অনুসরণ করেছেন। যে সময় কালপর্বে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের রূপানুসন্ধানে রত, একই সময়ে দাঁড়িয়ে ত্রৈলোক্যনাথ ইউরোপীয় ধাঁচের নভেলের পথ তিনি গ্রহণ করলেন দেশীয় ধাঁচের দেশীয় রীতি । তাছাড়া পরবর্তীতে ত্রৈলোক্যনাথের লেখাকে তাত্ত্বিকরা সাহিত্যের ইতিহাসে 'শিশুকিশোর সাহিত্য'-এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। বঙ্কিম যুগের অবসানের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব রীতি বাংলা সাহিত্যে আনলেন। দীর্ঘ সময়ের পর রবীন্দ্র নির্ভরতা কমানোর জন্য পরবর্তীতে 'কল্লোল' ও 'কালিকলম'-এর লেখক গোষ্ঠী রবীন্দ্র সাহিত্য বিরোধিতায় মেতে উঠলেন। যদিও এই সময়ে বিভিন্ন কথাসাহিত্যক দেশীয় রীতির ভাব নিয়ে

সাহিত্য রচনা করার চেষ্টা করা করেছিলেন- তার মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালি’, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধায়ের ‘হাঁসুলিবাঁকের উপকথা’ উল্লেখযোগ্য । কিন্তু এই দেশীয় রীতি নিয়ে ভাব নিয়ে লেখা উপন্যাসের সংখ্যা খুব সামান্যই ছিল, যা অল্পসময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যার ফলে ত্রৈলোক্যনাথের দেখানো পথ এবং তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি করা রীতি উপেক্ষিতই থেকে যায়। পরবর্তীতে পরশুরাম ত্রৈলোক্যনাথের মতোই নগর জীবনকে তাঁর ব্যঙ্গের বিষয় করলেন। হুবহু তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য না নিয়ে তিনি সমাজকে কটাক্ষ করার আদর্শ গ্রহন করলেন। সেই দিক থেকে পরশুরামকে তাঁর উত্তরসূরি বলা যেতে পারে।

আকর গ্রন্থপঞ্জি

১) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়,*ত্রৈলোক্য রচনা সংগ্রহ,* আনিসুজ্জামান (সম্পা),ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০১।

২) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়,*ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী* ,সুদেব মুখোপাধ্যায় (সম্পা), অখন্ড সংস্করণ, কলকাতা: কামিনী প্রকাশালয়,২০১৫।

৩) রাজশেখর বসু,*পরশুরাম গল্প সমগ্র,* দীপঙ্করবসু (সম্পা), কলকাতা : এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, অক্টোবর ২০১০।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) আব্দুল কাফি ও ঋকসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা),*ছায়াশরীর সেকাল একালের ভূতের গল্প,* কলকাতা : তৃতীয় পরিসর, জানুয়ারি ২০১৭।

২) অরুনকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬।

৩) উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, *উপেন্দ্রকিশোর রচনাবলী,* কলকাতা: সাহিত্যম্, ২০০০।

৪) জগদীশ ভট্টাচার্য, *আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী,* কলকাতা: ভারবি, জানুয়ারি ২০০৭।

৫) দীপক গোস্বামী, *পরশুরাম চরিত,* কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, মে ২০১৩।

৬) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,*ত্রৈলোক্যনাথ জীবনী ও সাহিত্য, সাহিত্য সাধকচরিতমালা,* তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৮৪।

৭) শ্রীভূদেব চৌধুরী,*বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার,* পঞ্চম প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩-২০১৪।

৮) শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী (সম্পা), *কবিকঙ্কন-চন্ডী,* কলকাতা: কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ২০০২।

৯) ড. মানসী সেনগুপ্ত,*ত্রৈলোক্যনাথের কথাসাহিত্য: চেনা জগত অচেনা স্বাদ,* কলকাতা : পুস্তক বিপনি, ২৫ শে ডিসেম্বর ১৯৯৭।

১০) শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (সম্পা) ও পৃথ্বীরাজ সেন (অনু),*ভৌতিক গল্প সমগ্র (বিশ্ব সাহিত্যের সুনির্বাচিত ভৌতিক গল্পের সংকলন)*,কলকাতা : প্রিয়া বুক হাউস, ২০১৭।

১১) সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু (সম্পা),*সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০১০।

১২) সুকুমার সেন ও সুভদ্রকুমার সেন(সম্পা), *উপছায়া,* কলকাতা: সিগনেট প্রেস, মে ২০১৭।

১৩) সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (তৃতীয় খন্ড), কলকাতা আনন্দ পাবলিশার্স, আশ্বিন ১৪২১ বঙ্গাব্দ।

পত্র-পত্রিকাপঞ্জি

১) প্রমথনাথ বিশী,*ত্রৈলোক্যনাথ রস সাহিত্য,* বিশ্বভারতী পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা, পঞ্চম বর্ষ।

২) পল্লব সরকার (সম্পা),*ক্রোড়পত্র রাজশেখর বসু,* অষ্ঠম বর্ষ, কলকাতা: সাম্পান পত্রিকা, অক্টোবর ২০১৮।

৩) বিনোদ ঘোষাল,*এ কোন ত্রৈলোক্যনাথ,* কলকাতা: আনন্দ বাজার পত্রিকা,২০১৫।

৪) সৌমিত্র বসু, *"ত্রৈলোক্যনাথ মখোপাধ্যায়: পুনর্বিবেচনা",* বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সপ্তম সংখ্যা, ১৯৯৫-৯৬।

বৈদ্যুতিন তথ্যপঞ্জি

১) ওয়েব লিঙ্ক- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ghost_story,Date 14-03-2019, Time 10 a.m .